রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ

একটি ফোটো চুরির রহস্য

বিমল কর
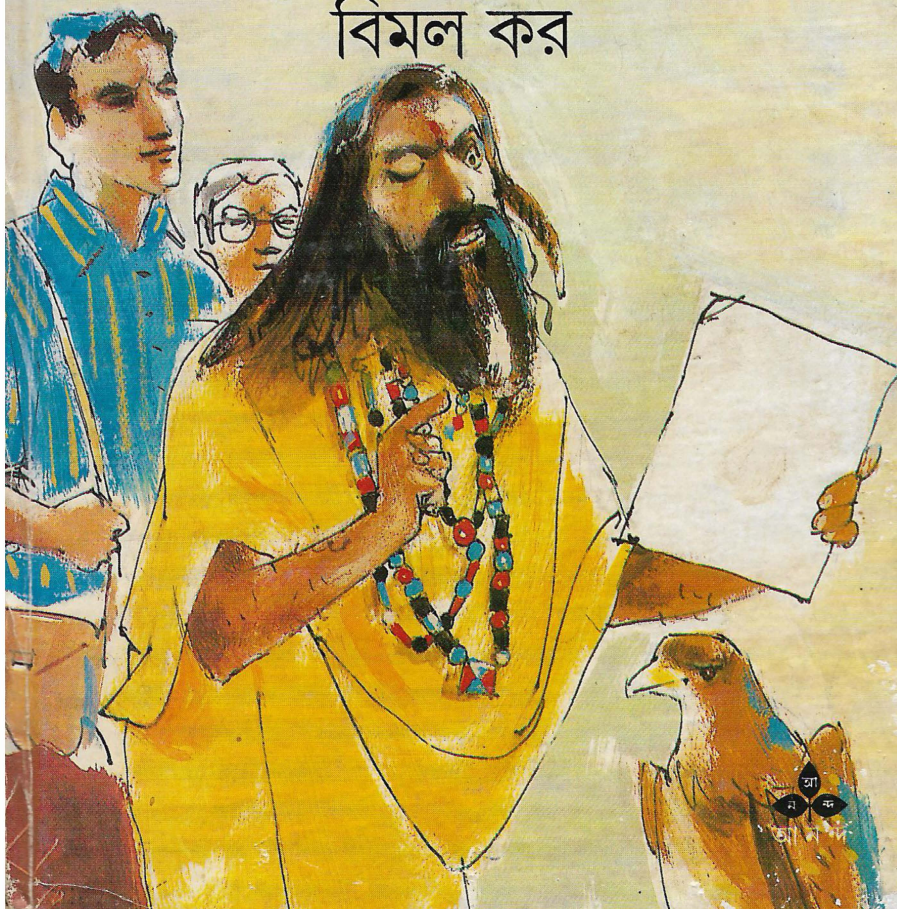
আনন্দ

একটি ফোটো চুরির রহস্য

বিমল কর

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত চৌধুরী

ছুটকুকে
দাদাই

হঠাৎ একটা রব উঠল। আঁতকে ওঠার।

পথচলতি লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছিল দৃশ্যটা। গেল গেল রব।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভয়ঙ্কর কিছু ঘটল না। লোকটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোনওরকমে সামলে নিল। তবু ফুটপাথেই ছিটকে পড়েছিল।

ট্রাম দাঁড়ায়নি। চলে গেল সোজা। ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো লোকগুলো দেখল মানুষটাকে।

কাটাও পড়েনি। চাকার তলাতেও যায়নি। তবে আর ট্রাম বাস থামবে কেন! কলকাতা শহরে হামেশাই ট্রাম বাস মিনিবাস থেকে লোকজন ছিটকে পড়ছে রাস্তায়, তার জন্যে গাড়িটাড়ি দাঁড়াবেই বা কোন দুঃখে?

রাস্তায় ছিটকে-পড়া লোকটা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

কাছাকাছি পথচলতি মানুষের নানান মন্তব্য : "আর একটু হলেই তো হয়ে গিয়েছিলেন, দাদা; বরাত জোর...।" অন্য কে যেন বলল, "রাখে হরি মারে কে! বেঁচে গিয়েছেন, মশাই।" এক ছোকরা মশকরা করে বলল, "দাদু, এল বি হয়ে যাচ্ছিলেন যে! লেগ চাকার তলায় চলে যাচ্ছিল। আম্পায়ার বাঁচিয়ে দিয়েছে এ-যাত্রায়।"

ভিড় সরে গেল। কাজের মানুষ সবাই, কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিকিরার নজরে পড়েছিল দৃশ্যটা। এগিয়ে এলেন সামান্য তফাত থেকে।

"আরে, পাতকী না?"

লোকটা ততক্ষণে নিজের হাত-পা দেখছে। হাত ছড়েছে দু' জায়গায়, কনুইয়ে লেগেছে, হাঁটু সোজা করতে কষ্ট হচ্ছিল।

কিকিরার দিকে তাকাল লোকটা। তার নাম পাতকী নয়। পিতৃদত্ত নাম পতাকী। কিকিরা তাকে পাতকী বলে ডাকেন।

কিকিরাকে দেখে পাতকীর চোখে জল এসে গেল। যন্ত্রণাও হচ্ছিল।

"দেখলেন বাবু, আমি নামতে যাব, আমায় ল্যাং মেরে ফেলে দিল।" বলেই পতাকী চারপাশে দেখতে লাগল। "আমার ব্যাগ?"

"ব্যাগ!"

পতাকী খোঁড়াতে খোঁড়াতে ট্রাম লাইন পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে দেখল। নজর করল এপাশ-ওপাশ। তারপর প্রায় কেঁদেই ফেলল। "আমার সর্বনাশ হয়ে গেল রায়বাবু। এখন আমি কী করব?"

"কেমন ব্যাগ?"

"ছোট ব্যাগ! আধ হাত চওড়া হবে। বুকের কাছে ধরে রাখি...।"

"চামড়ার? প্লাস্টিকের মতন দেখতে?"

"কালো রং।"

কিকিরা বললেন, "সে তো একটা ছোকরা উঠিয়ে নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তোমার সঙ্গেই নেমেছিল ট্রাম থেকে।"

"পকেটমার। চোর। প্যান্ট আর গেঞ্জি পরা! রঙিন গেঞ্জি? লাল-সাদা চাকা চাকা গেঞ্জি।"

"তাই তো দেখলাম।"

"দেখেছেন বাবু! আমি ঠিক ধরেছি। বেটা আমায় তখন থেকে নজর করছিল। পিছু নিয়েছিল। ওকে আমার সন্দেহ হচ্ছিল

আগাগোড়া। ওরই জন্যে আগে আগে নেমে পড়তে গেলাম ট্রাম থেকে। ...আমার এখন কী হবে বাবু?”

কিকিরা বললেন, “টাকা-পয়সা ছিল?”

‘টাকা বেশি ছিল না। সোয়া শ’ মতন। আদায়ের টাকা। কয়েকটা কাগজপত্র, রসিদ, টুকটাক...”

“অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে হে! এত ছটফট করো না।”

“টাকার জন্যে নয় বাবু। ওর মধ্যে একটা অন্য জিনিস ছিল। কী জিনিস আমি জানি না। জহরবাবু বলে দিয়েছিলেন, খুব সাবধানে আনতে।”

কিকিরা অবাক হলেন। দেখলেন পতাকীকে।

“ঠিক আছে। পরে কথা হবে। এখন চলো চাঁদনিচকের উলটো দিকে আমার চেনা একটা ওষুধের দোকান আছে, তোমার কাটা-ছেঁড়া জায়গাগুলোর ব্যবস্থা করা যাক।”

পতাকী বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিকিরা কান করলেন না। বাধ্য হয়েই পতাকীকে এগিয়ে যেতে হল।

সামান্য এগিয়েই ওষুধের দোকান।

পতাকী দোকানের বাইরের দিকের একটা বেঞ্চিতে বসে থাকল, একটি রোগামতন ছেলে, ওষুধের দোকানের, অভ্যস্ত হাতে পতাকীর কাটা-ছেঁড়া জায়গাগুলো পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিল, দু’-এক জায়গায় ব্যান্ড-এইড। তারপর এক ইনজেকশন।

পতাকী না-না করছিল। তার কাছে পয়সাকড়ি না-থাকার মতন। কিকিরা শুনলেন না। রাস্তার ধুলোবালি লেগে মরবে নাকি! পয়সার ভাবনা করতে হবে না তোমায়।

ইনজেকশনের পর কয়েকটা ট্যাবলেটও পতাকীর হাতে গুঁজে দেওয়া হল। তার আগে ব্যথা-মরার একটা বড়িও সে খেয়েছে।

পতাকীকে নিয়ে উঠে পড়লেন কিকিরা।

"চলো হে পাতকী, কোথাও বসে একটু জিরিয়ে নেবে চলো। চা খাওয়া যাবে।"

পতাকীকে ভাল করেই চেনেন কিকিরা। বড়াল লেনের শরিকি বাড়ির একটা ঘরে থাকে। মাথার ওপর ওইটুকুই তার আশ্রয়। সংসার রয়েছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে। পতাকী আগে হালদারদের স্টুডিয়োয় কাজ করত। সারাদিনই পাওয়া যেত দোকানে। স্টুডিয়োর কর্মচারী। 'হালদার স্টুডিয়ো'র বুড়ো মালিক রামজীবনবাবু তখন বেঁচে। তিনি বেঁচে থাকলেও এককালের নামকরা পুরনো হালদার স্টুডিয়ো তখন ডুবতে, মানে উঠে যেতে বসেছে। নতুন নতুন স্টুডিয়ো, তাদের জেল্লা, রকমারি কায়দা-কানুনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না, আদ্যিকালের ব্যবস্থা কি একালে চলে!

রামজীবনবাবু মারা গেলেন, ষাটের ঘরে এসেই। পায়ের সামান্য একটা কারবাঙ্কল বিষিয়ে কী যে হয়ে গেল—! বাঁচানো গেল না। দোকানটা অবশ্য থাকল। রামজীবনের ছেলে জহর নিজেই বসতে লাগল দোকানে। তাদের সংসারের অবস্থা মাঝারি। নিজেদের বাড়িও আছে মলঙ্গা লেনে। দিন আনি দিন খাই—না করলেও চলে। তা ছাড়া জহরের একটা চাপা আত্মমর্যাদা রয়েছে। তার বাবার হাতে গড়া হালদার স্টুডিয়োর জন্ম সেই উনিশশো বিশ বাইশে। সোজা কথা! বাবার তখন ছোকরা বয়েস, টগবগে রক্ত, স্বদেশি করার জন্যে মাসকয়েক জেলও খেটেছেন। বাবার মাথায় কেন স্টুডিয়োর চিন্তা এসেছিল কেউ জানে না। তবে তাঁর হাত আর চোখ ছিল ভাল, ফোটো তোলায় ভীষণ ঝোঁক। কলকাতা শহরে তখন ক'টাই বা স্টুডিয়ো!

হালদার স্টুডিয়ো বেশ নাম করেছিল তখন।

সময় বসে থাকে না। জল গড়িয়ে যাওয়ার মতন সময়ও চলে

গেল। রামজীবন নেই। কিন্তু তাঁর স্মৃতির সঙ্গে কিছু পুরনো কাজও আছে—যার মূল্য কম কী!

পতাকীকে বাবা যখন রাখেন দোকানে, তখন তিনি প্রৌঢ়। পতাকী ছোকরা। আজ পতাকীর বয়েস অন্তত চল্লিশ।

বড়বাবু বেঁচে থাকলে কী হত পতাকী জানে না। তবে জহর অনেক ভেবেচিন্তেই পতাকীকে সারাদিনের জন্যে দোকানে রাখতে চায়নি। আজকের দিনে একটা মানুষকে সারাদিনের জন্যে রাখতে হলে যত টাকা দেওয়া দরকার জহর তা পারে না। কাজেই সে অন্য ব্যবস্থা করে নিয়েছে। পতাকী বাইরে আর দুটো কাজ করুক, তাতে তার রোজগার বাড়বে খানিকটা, সেইসঙ্গে হালদার স্টুডিয়োর কাজ।

পতাকী তাতেই রাজি। সে অন্য অন্য কাজের সঙ্গে হালদার স্টুডিয়োর কাজ করে। তার কোনও অভিযোগ নেই। জহরকে সে নাম ধরেই ডাকে দোকানে, জহরদা; বাইরে বলে জহরবাবু। জহরও তাকে পতাকীদা বলে ডাকে।

পতাকী মানুষ হিসেবে সাদামাঠা সরল। কিন্তু অনেক সময় এমন সব গোলমাল পাকায়, ভুল করে বসে যে মনে হয়, তার বুদ্ধির পরিমাণটা অত্যন্ত কম। জহর বিরক্ত হয়, রাগ করে, তবু পতাকীর সরলতা আর বোকা স্বভাবের জন্যে তাকে কড়া কথাও বলতে পারে না। কী হবে বলে! অবশ্য বিরক্তি আর অসন্তোষ তো চাপা থাকে না, লুকনো যায় না সবসময়। তাতেই পতাকী যেন নিজের অক্ষমতার জন্যে কুঁকড়ে যায়।

চা খেতে খেতে কিকিরা পতাকীকে বললেন, "তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? জহর কিছু বলবে না।"

"বলবে না! না রায়বাবু, জহরদা আমায় বারবার করে বলে

দিয়েছিল, জরুরি জিনিস, কাজের জিনিস, সাবধানে নিয়ে যেতে!"

কিকিরা হাসলেন। হালকা গলায় বললেন, "তোমার মাথায় সত্যি কিছু নেই। জরুরি কাজের জিনিস হলে ওভাবে কাউকে নিয়ে আসতে বলে! তোমার আধ হাতের পুরনো প্লাস্টিকের ব্যাগে কোন মহামূল্যবান জিনিস আনতে বলবে জহর? নিশ্চয় হিরে-জহরত নয়, পঞ্চাশ একশো ভরি সোনাদানাও নয়।"

"আজ্ঞে না, তেমন কিছু তো নয়।"

"তবে?"

"আমি জানি না বাবু। শুধু জানি, একটা শক্তপোক্ত খাম ছিল। খামের ওপরের কাগজটা পুরু। মোটা নয় খামটা। তবে শক্ত। খামের মুখ বন্ধ। সিল করা। রেজিস্টারি চিঠির মতন অনেকটা।"

কিকিরা অবাক হলেন। দেখছিলেন পতাকীকে। কী বলছে ও? একটা সিল-করা খাম অত জরুরি হয় নাকি? খামের মধ্যে কী থাকবে? টাকা! টাকা থাকলেও কত আর হতে পারে!

"মোটা, পুরু, ভারী খাম নাকি?" কিকিরা বললেন।

"এমনিতে খামটা মোটা নয়, ভারীও নয়। তবে ভেতরটা শক্ত বলেই মনে হয়েছিল।"

"লম্বা খাম?"

"আজ্ঞে না; মাঝারি মাপের।। ধরুন লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক, চওড়ায় চার পাঁচ ইঞ্চি হবে।"

"কিছু লেখা ছিল না ওপরে?"

"না।"

"কার কাছ থেকে আনছিলে?"

"ঠনঠনিয়ার পাঁজাবাবুর কাছ থেকে।"

কিকিরা পাঁজাবাবুকে জানেন না, চেনেন না। পাতকীও চেনে না বলল। অনেক আগে হয়তো দু'-একবার দেখেছে।

"তিনি তোমায় কিছু বলে দেননি?"

"না। শুধু বলেছিলেন, জহরকে দিয়ে দেবে।। দরকারি জিনিস।"

"কিকিরার মাথায় কিছুই এল না। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, "একটা কাগজ নিয়ে এসো তো!"

পতাকী দোকানের মালিকের কাছ থেকে একচিলতে কাগজ এনে দিল।

কিকিরার কাছে ডট পেন ছিল। তিনি নিজের নাম ঠিকানা ফোন নম্বর লিখে কাগজটা পতাকীর হাতে দিলেন।

"এটা জহরকে দিয়ে দিয়ো," কিকিরা বললেন, "তুমি যে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছ, তোমার হাতের ব্যাগ খোয়া গিয়েছে, চোরছ্যাঁচড় নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমাকে সাক্ষী মানতে পারো। জহর তোমায় অবিশ্বাস করবে না। ...আর ওকে বলো, আমায় ফোন করতে। দরকার হলে ফোন করবে। আজ সন্ধেতেও করতে পারে। আমি বাড়িতেই থাকব। কাল সকালেও পারে। এনি টাইম।...এখন তুমি যেতে পার। সাবধানে যাবে। ওষুধগুলো মনে করে খেয়ো। নয়তো ভুগবে।"

পতাকী কেমন করুণ গলায় সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, "বাবু, আপনার টাকাগুলো দিতে পারছি না এখন।"

"ঠিক আছে। ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। এখন এসো। পকেটে খুচরো আছে, না তাও গিয়েছে?"

পাতকী মাথা নাড়ল। পকেটে খুচরো আছে কিছু। চলে যেতে পারবে।।

"তবে এসো।"

চলে গেল পাতকী।

কিকিরার চুরুট ছিল না পকেটে। ফুরিয়ে গিয়েছে। চায়ের

দোকানের ছোকরাটাকে ডেকে টাকা দিলেন বাইরের পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিতে।

দোকানে এতক্ষণ তেমন একটা ভিড় ছিল না। সবে শুরু হল। দু'-চারজন এইমাত্র কথা বলতে বলতে ঢুকল। অফিসের বাবু।

এখনও পুরোপুরি গরম পড়েনি, ফাল্গুনের মাঝামাঝি। দোকানের পাখাগুলো ধীরে ধীরে চলছে। বাইরে রোদ পড়ে এসেছে। দুপুরের ঝলসানি নেই, আলো যথেষ্ট। বিকেল হয়ে গেল।

সিগারেটের প্যাকেট হাতে পেয়ে কিকিরা অন্যমনস্ক ভাবে প্যাকেট খুললেন, সিগারেটও ধরালেন একটা।

পাতকীর কথাই ভাবছিলেন। ও যে ঠিক কী বোঝাতে চাইল, কিকিরা ধরতে পারেননি। কলকাতা শহরে পকেটমারের অভাব নেই। বিশেষ করে এই সময়টায়, অফিস ছুটির মুখে ওদের ব্যস্ততা খানিকটা বাড়বে যে, তাতে আর সন্দেহ কোথায়! কিন্তু পাতকীর কথামতন ওই ছোকরা অনেকক্ষণ থেকে তাকে নজরে রেখেছিল কেন? পাতকী ট্রাম থেকে নামার সময় গায়ে গায়ে লেগে ছিল। কেন? কিকিরার হাতের মামুলি ছোট ব্যাগটায় কত টাকা বা কী এমন সোনাদানা থাকতে পারে যে, তার গন্ধে গন্ধে ছোকরা পাতকীর পিছনে লেগে থাকবে! জানবেই বা কেমন করে। তবে কলকাতা শহরের পকেটমারগুলোর চোখ, অনুমানশক্তি দারুণ। বেটাদের অভিজ্ঞতাও প্রচুর। স্যাকরা বাড়ি থেকে দোকানের বিশ্বস্ত কর্মচারী রেশন-ব্যাগের মধ্যে সোনার হার বালা চুড়ি নিয়ে কোনও জানাশোনা খরিদ্দারের বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে, অদ্ভুতভাবে সেই ব্যাগ হাওয়া হয়ে গেল! তা থাক, সে অন্য কথা। পাতকীর ব্যাপারটি আসলে কী! কিকিরা অবাকই হচ্ছিলেন।

সন্ধেবেলায় ফোন।

তারাপদদের সঙ্গে গল্পগুজব হাসি-তামাশা করছিলেন কিকিরা। এমন সময়ে ফোন।

কিকিরা মনে মনে আন্দাজ করে নিলেন কার ফোন হতে পারে।

"হ্যালো?"

"রায়কাকা? আমি জহর।"

"হ্যাঁ, রায় বলছি। তোমার কথাই ভাবছিলাম। পাতকীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"আমি একটু বেরিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি পতাকীদা দোকানে বসে আছে। শুকনো মুখ, হাতে পায়ে তাপ্পি লাগানো। কাঁপছে। জ্বর এসে গিয়েছে যেন।"

"শুনলে সব?"

"শুনলাম। আপনার লেখা কাগজের টুকরোটাও পেলাম।"

"পাতকী আছে, না, চলে গিয়েছে?"

"চলে গেল খানিকটা আগে। আমিই বললাম, তুমি এভাবে তখন থেকে বসে আছ! যাও, বাড়ি যাও।"

"ভালই করেছ! ওর খুব কষ্ট হচ্ছিল। বেচারি পড়েছেও বিশ্রীভাবে। আর একটু বেকায়দায় পড়লে ট্রামের চাকার তলায় চলে যেতে পারত।। ভাগ্য ভাল; অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে।"

"আপনি সব দেখেছেন?"

"দেখেছি। ...মানে চোখে পড়ে গিয়েছে হঠাৎ। এই সময় আমি

ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম।”

জহর একটু চুপ করে থেকে বলল, “কী হল বলুন তো? পকেটমারের কেস? ছিনতাই? পতাকীদার কথা শুনে মনে হচ্ছে—” জহর কথাটা শেষ করল না।

“কী হল আমি কেমন করে বলব! তুমিই বলতে পারো। পাঁজাবাবুর বাড়ি থেকে পাতকী কী এমন আনতে গিয়েছিল যে—”

কিকিরাকে কথা শেষ করতে দিল না জহর। বলল, “ফোনে অত কথা বলা যাবে না রায়কাকা। আমি নিজেই বোকা হয়ে গিয়েছি। আপনি কাল সকালে বাড়ি আছেন?”

“কোথায় আর যাব। বাড়িতেই আছি।”

“তা হলে কাল আমি যাচ্ছি। দেখা হলে সব বলব।”

“চলে এসো।”

“তা হলে ফোন রাখছি। কাল দেখা হবে।”

কিকিরাও ফোন নামিয়ে রাখলেন।

তারাপদরা কিকিরার কথা শুনছিল। অনুমান করছিল, কিছু একটা ঘটেছে। কী, তা তারা জানে না।। কিকিরা বলেননি।

“কী কেস, সার? আপনি তো কিছু বলেননি আমাদের?” চন্দন বলল। বলে তারাপদকে আড়চোখে কীসের যেন ইশারা করল।

তারাপদ বলল, “আপনি আজকাল হাইডিং করছেন, কিকিরা। ভেরি ব্যাড।”

কিকিরা বললেন, “হাইডিং নয় হে, ওয়েটিং। দেখছিলাম, ব্যাপারটা তুচ্ছ, না, পুচ্ছ।”

“কার সঙ্গে টক করছিলেন?”

“জহর। হালদার স্টুডিয়ো, মানে ফোটোগ্রাফির দোকানের একটি ছেলে।। মালিক। আমাকে কাকা বলে। ওর বাবাকে আমরা দাদা বলতাম।”

"মোদ্দা ব্যাপারটা কী?"

"আজকের ঘটনাটা বলতে পারি শুধু। বাকিটা আমি জানি না। কাল জহর আসার পর জানতে পারব মোটামুটি।"

"আজকেরটা শুনি।"

কিকিরা দুপুরের ঘটনা বর্ণনা করলেন সবিস্তারে।

তারাপদরা মন দিয়ে শুনছিল।

কিকিরার বলা শেষ হলে তারাপদ উপেক্ষার গলায় বলল, "এটা আবার কোনও কেস নাকি সার! আপনি আমি চাঁদু সবাই জানি চাঁদনিচক একটা বাজে জায়গা। জ্যোতি সিনেমার চারদিকে পিকপকেট-অলাদের রাজত্ব। ওটা ওদের এলাকা। একবার পকেট কাটতে পারলে এ-গলি ও-গলি, মায় চাঁদনির ওই বাজারে ঢুকে পড়তে পারলে কার বাবার সাধ্য ওরকম গোলকধাঁধার মধ্যে তাকে খুঁজে বার করে। অসম্ভব।... আপনি যাই বলুন, এটা সিম্পল পিকপকেট কেস! তিলকে তাল করার কোনও দরকার নেই।"

কিকিরা মাথা দোলাবার ভঙ্গি করে বললেন, "আমারও প্রথমে সেরকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু জহরের ফোন পাওয়ার পর খটকা লাগছে।"

"কেন?"

"মামুলি পকেটমারের ব্যাপার হলে ও বলেই দিত, চোর-ছ্যাঁচড়ের ব্যাপার, পাতকী নিজের বোকামির জন্যে ব্যাগ খুইয়েছে। তা তো বলল না, বরং কাল দেখা করতে আসবে বলল।"

চন্দন কী যেন ভাবছিল। বলল, "আপনি পতাকী—না পাতকীকে কতদিন চেনেন?"

"তা অনেকদিন। কেন?"

"লোকটা চালাক, না বোকা?"

"চালাক-চতুর বলে জানি না। তবে নিরীহ। খানিকটা কাছাখোলা

ধরনের। তুমি এসব কথা বলছ্ কেন?”

“ওই্ জহর না কী নাম বললেন, তাকেও চেনেন অনেকদিন, তাই না?”

“চিনি। ওর বাবাকেই বেশি চিনতাম।”

“আপনার কাছে নানারকমের লোক আসে। পুরনো আলাপী লোককেও আসতে দেখেছি। কই জহর বলে কাউকে তো দেখিনি কোনওদিন।”

কিকিরা মাথার চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, “তোমরা দেখোনি তাতে কী হয়েছে গো। আমার বয়েসটা কত হল খেয়াল করেছ! বুড়ো গাছের অনেক ডালপালা। তা সে যাকগে।... তুমি তারাবাবু যা বলতে চাইছ, আমি নিজেও ভাবছিলাম সেরকম। পাতকীর ব্যাগ হাতিয়ে পালানোর ব্যাপারটা নেহাতই চোর-পকেটমারের কাণ্ড। বোকা হাবাগোবা মানুষকে হাতের কাছে পেয়েছে, সুযোগ ছাড়েনি।”

“তা ছাড়া আবার কী!” তারাপদ বলল, “এ সেরেফ পাতি পকেটমারের কাণ্ড। একটা কথা, সার। লোকটা জেনেশুনে আপনার পাতকীর ব্যাগ ছিনতাই করেছে—হতেই পারে না। সে জানবে কেমন করে কী আছে ব্যাগে? টাকা-পয়সা থাকা স্বাভাবিক, তা পঞ্চাশ একশোই হোক বা কম-বেশি!”

“তোমার যুক্তি ঠিক। আমি আগেও বলেছি। কিন্তু জহরের ফোন পেয়ে মনে হচ্ছে, একটা গণ্ডগোল রয়েছে কোথাও!”

“কেন?”

“নয়তো জহর ফোনে ওভাবে কথা বলত না। বলত, পতাকীদার পকেটমার হয়েছে তো হয়েছে। অমন হয়, পতাকীদা অকারণ ভাবছে, এটা তার গাফিলতি। বারবার আপনাকে ফোন করে সাক্ষী মানতে বলছে। বোঝাতে চাইছে তার কোনও দোষ নেই।” কিকিরা পকেট হাতড়াতে লাগলেন, বোধ হয় নেশা খুঁজছিলেন। বললেন,

"কিন্তু এখন দেখছি, ব্যাপারটা অত তরলং নয়।"

"তরলং মানে?"

"মানে জলবৎ তরলং নয় বোধ হয়। গোলমাল একটা আছে নিশ্চয়।"

"তরলং নয়। জটিলং..." চন্দন হাসল।

"ধরে নিচ্ছি। নয়তো জহর নিজে কেন কাল এসে দেখা করতে চাইছে! একটু খোঁচা থাকবে না হে!"

তারাপদ চুপ করে গেল। কিকিরার কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতন নয়। সামান্য ও স্বাভাবিক ব্যাপার হলে সত্যি সত্যিই জহরের এত তড়িঘড়ি করে কিকিরার কাছে আসার দরকার ছিল না। সে নিশ্চয় কিছু বলতে আসবে।

কৌতূহল বোধ করলেও তারাপদদের পক্ষে, কাল-পরশু বিকেলের আগে কিছুই জানতে পারবে না। তারাপদদের অফিসে এখন কাজের চাপ বেশি। টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে ছ'টা বেজে যায়। এই মাসটা এইরকমই চলবে। আর কাল চন্দনের দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে হবে।

আরও খানিকটা বসে তারাপদ উঠে পড়ল। "চলি, সার। পরশু দেখা হবে। তখন শুনব আপনার জহর কী বলে গেল। চল রে চাঁদু।"

ওরা চলে গেল।

কিকিরা বসেই থাকলেন। ভাবছিলেন। জহরের সঙ্গে তাঁর মাঝেমধ্যে দেখা হয়ে যায় রাস্তাঘাটে। ওর দোকানে শেষ গিয়েছেন কিকিরা মাসকয়েক আগে। কোনও কাজে নয়, এমনি। যাচ্ছিলেন এক কাজে, হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে যাওয়ায় মাথা বাঁচাতে গিয়ে হালদার স্টুডিয়োর দোকানটা চোখে পড়ে গেল। ঢুকে পড়লেন।

দোকানে লোক ছিল না। জহর ডার্করুমে কাজ করছিল, বেরিয়ে এল।

আধঘণ্টাখানেক ছিলেন কিকিরা। গল্পগুজব হল। জহরের বাড়ির খবর ভাল নয়। মায়ের অসুখ। হার্টের গোলমাল। ওর স্ত্রী ভুগছে চোখ নিয়ে। লাফ মেরে মেরে পাওয়ার বাড়ছে। ডাক্তার বলছে, এভাবে চললে শেষমেশ কী দাঁড়াবে কে জানে। আর ওর ছেলেটা একেবারে দস্যু হয়ে উঠছে। সামলানো যায় না।

দোকানের কথা তুলেছিলেন কিকিরা। "পুরনো দোকান, আজকাল ব্যবসার বাজারে খানিকটা চাকচিক্য প্রয়োজন, জহর। তুমি তো নিজেই বুঝতে পারো, পুরনো ব্যাপারগুলো সব পালটে যাচ্ছে, কতরকম ক্যামেরাই তো এসে গিয়েছে বাজারে। কালার ফোটোগ্রাফির এখন রমরমা।"

জহর জানে। রঙিন ফোটো সেও তোলে। তবে তার বাবার আমলে রং সেভাবে আমদানি হয়নি। বাবার তোলা সমস্ত ছবি সাদা-কালো।

আসলে জহর যদি মোটাসোটা টাকা ঢালতে পারত দোকানে, হালদার স্টুডিয়োর চেহারা-চমক পালটে দিত। তার অত টাকা নেই। টাকা না থাকা যদি প্রধান কারণ হয়, দ্বিতীয় কারণ—জহরের মতে, একজন ভাল ফোটোগ্রাফার যদি আর্টিস্টের ধারেকাছে পৌঁছতে চায়, তাকে সাদা-কালোয় কাজ দেখাতে হবে।

কিকিরা বুঝুন বা না-বুঝুন জহরের কথাগুলো তাঁর ভালই লাগে। ছেলেটার গুণ আছে, জেদও রয়েছে।

নিজের বসার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েন কিকিরা। ঘরের মধ্যে পায়চারি করারও জায়গা নেই। একেবারে ঠাসা। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। বাতাস আসছে ছোট পার্কটার দিক থেকে।

হঠাৎ তাঁর মনে হল, একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। জহরের ফোন নম্বরটা নেওয়া হয়নি। খেয়াল ছিল না। অবশ্য টেলিফোনের গোবদা

বইটায় হালদার স্টুডিয়োর ফোন নম্বর পাওয়া কঠিন কাজ নয়। পেতেই পারেন কিকিরা। তবে অত ব্যস্ততার কী আছে। তা ছাড়া জহর দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে এতক্ষণে! তার বাড়িতে ফোন হয়তো আছে। কার নামে কে জানে! খুঁজেপেতে নম্বরটা পাওয়া গেলেও লাভ কী ফোন করে!

কিকিরার কী খেয়াল হল, কেন হল, তাও জানেন না, নিজের জায়গায় ফিরে এসে ফোন তুললেন।

রিং করতেই সাড়া এল।

"পানুদা, আমি কিঙ্কর কথা বলছি।"

ক্রিমিনাল কেসের ওকালতি করতে করতে পানু মল্লিক বা পান্নালাল মল্লিকের গলার স্বর খেসখেসে কর্কশ হয়ে গিয়েছে।

"রায়। কী ব্যাপার! তুই—?"

পানু মল্লিক কিকিরাকে 'তুমি' 'তুই'—যখন যা মনে আসে, বলেন।

"আপনি কি মক্কেল নিয়ে বসে আছেন?"

"না। আমি ওপরে রয়েছি। নীচে নামিনি। প্রেশার সামলাচ্ছি। আজ কোর্টে বড় দমবাজি করতে হয়েছে। টায়ার্ড।... তা তুমি ব্রাদার ফোন করছ! কোথ্ থেকে?"

"বাড়ি থেকে। আমার একটা ফোঁ হয়েছে।"

"ফোঁ?"

"ফোন!"

"সু-খবর। তোমার টিকি ধরা যাবে। নাম্বারটা বলে রেখো।... ইয়ে, হঠাৎ আমায় মনে পড়ল কেন ভায়া। বেকায়দা কিছু করেছ?"

কিকিরা হাসলেন। কে কাকে বেকায়দায় ফেলে। পানুদাই তার গলায় হরিচন্দনবাবুর ঝামেলা জুটিয়েছিলেন।

"পানুদা, আপনি যেদিকে থাকেন সেখানে পাঁজাবাবু বলে

কাউকে চেনেন?”

“পাঁ-জা! আমাদের ওখানে?”

“ঠনঠনিয়া পাড়ায়।”

“কই মনে পড়ছে না। কী করে? গলি, বাড়ির নম্বর?”

“এখনও জানি না। কাল জানতে পারব।”

“জানিও খোঁজ করব। কী দরকার বলো তো।” বলেই চুপ করে গেলেন পানুবাবু। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় বললেন, “তুমি কি বিনয় পাঁজার কথা বলছ?”

“বিনয় পাঁজা! চেনেন?”

“আলাপ নেই। নাম শুনেছি। আমি তো ঠিক ঠনঠনিয়া পাড়ার লোক নই।... তা কী দরকার তোমার?”

“পরে বলব। আমি ঠিক এই মুহূর্তে জানি না কিছু। কী করেন উনি? মানে পাঁজাবাবু?”

“বলতে পারব না। তবে শুনেছি ভেরি ওল্ড ফ্যামিলি। কত ওল্ড কে জানে! বাড়িটা দেখেছি। তেতলা ইটের পাঁজা। তুমি কোথাও প্লাস্টার দেখতে পাবে না। খড়খড়িঅলা সেকেলে দরজা জানলা। তেতলায় বিস্তর পায়রা উড়ে বেড়ায়। আগে একটা ফিটন গাড়ি দেখতাম, এখন দেখি না। বোধ হয় ঘোড়া মরে গেছে।... সে যাকগে, তুমি পাঁজামশাইয়ের খবর নিচ্ছ কেন?”

“পরে বলব। কালও বলতে পারি। এখন আমি কিছু জানি না, পানুদা। নাথিং।”

“ঠিক আছে। রাত্রে ফোন করো।... তোমার ফোঁ-নম্বরটা বলো একবার, টুকে রাখি।”

কিকিরা নম্বর বললেন।

পরের দিন জহর এল। সকাল সকালই এসেছে।

কিকিরা বললেন, "এসো। আমি ভাবছিলাম তোমার না দেরি হয়!"

কিকিরাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল জহর। বড় পরিবারের ছেলে; সহজ শিষ্টাচার, সহবত ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

জহরকে দেখতে সাধারণ। মাঝারি লম্বা। স্বাস্থ্য ভালই। পলকা নয় আবার মেদবহুল নয়। মাথার চুল কোঁকড়ানো। চোখ-নাক পরিষ্কার। সামনের একটা দাঁত আধ-ভাঙা। তবে ওর চোখ দুটিতে কেমন একটা আবেগ মাখানো। মনে হয়, ভাবুক বা কল্পনাপ্রবণ।

"বোসো, চা-টা খাও। তাড়া নেই তো?"

জহর বসবার আগেই কিকিরার জন্যে অপেক্ষা করল। "আপনি বসুন।"

কিকিরা বসলেন।

"আমি প্রথমে পতাকীদার বাড়ি গিয়েছিলাম। কেমন আছে খবর নিয়ে এলাম।"

"কেমন আছে?"

"পায়ে হাতে প্রচণ্ড ব্যথা। রাত্রে জ্বরও এসেছিল। সকালে কম। এখন দু'-তিনদিন বসে থাকতে হবে বাড়িতে।"

"জোরেই পড়েছিল। ...তা ও আসবে না। তোমার দোকান?"

"ও ব্যবস্থা করে নেব। আজ একজনকে বলে এসেছি দোকানটা খুলে দেবে। দশটায় খুলি। এখান থেকে ফিরতে ফিরতে যদি দশটা

বেজে যায়— তাই বলে এসেছি। দুপুরে একবার বাড়ি যাব, খাওয়া-দাওয়া সেরে আসতে। বিকেল থেকে দোকানেই থাকব।”

জহরের বাড়ির খবরাখবর নিলেন কিকিরা অভ্যাসমতো।

“তারপর,” কিকিরা বললেন। “কাজের কথা শুনি। ব্যাপারটা কী, জহর?”

জহর বলল, “কাকা, আমি নিজেই জানি না ভেতরের ব্যাপারটা কী! গত পরশুদিন আমায় এক ভদ্রলোক, পাঁজাবাবু, দোকানে ফোন করে বললেন যে, আমাদের তোলা তোলা ফোটো, তাঁর মায়ের, ওঁদের বাড়িতে রয়েছে। সেই ফোটো থেকে ফুল সাইজ, মানে পুরো বড় সাইজের একটা এনলার্জড কপি করে দিতে হবে। কোথাও কোথাও ‘রিটাচ’ দরকার।”

“তোমাদের দোকানের, মানে স্টুডিয়োতে তোলা ফোটো?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের তোলা, তবে স্টুডিয়োতে নয়। ওঁদের বাড়িতে গিয়ে তোলা।”

“তা ও-বাড়ি থেকে ফোটো পাঠাবে কেন? তোমাদের স্টুডিয়োয় ছবিটার নেগেটিভ নেই?”

জহর মাথা নাড়ল। আলগা ধরনের হাসি। বলল, “না। সব ফোটোর কি নেগেটিভ রাখা যায়! স্পেশ্যাল হলে রাখা যায়। আছেও আমাদের। এমনি অর্ডিনারি ফোটোর নেগেটিভ রাখব কেন! সম্ভব নয়। কাস্টমারকেই দিয়ে দিই। আমাদের স্টুডিয়োয় ইম্পর্ট্যান্ট ঘটনা, বিশিষ্ট বিখ্যাত মানুষজনের কারও কারও ফোটোর নেগেটিভ এখনও আছে। প্রিন্টও আছে কিছু। কিন্তু রাম-শ্যাম যদু-মধুর নেগেটিভ নেই। রাখি না? কেউ রাখে না। তা ছাড়া, কাকা, আগেকার দিনের ফিল্মের কোয়ালিটি আজকের মতন ছিল না। রাখলেও নষ্ট হয়ে যেত।”

“ফোটোটা কে তুলেছিল?”

"আমি।"

"কতদিন আগে?"

"আমার সঠিক মনে নেই। উনি যা বললেন তাতে মনে হল, ছ'-সাত বছর আগে।"

"তোমার স্টুডিয়োতে নয়!"

"না, পাঁজাবাবুর বাড়িতে গিয়ে। তাঁর বিধবা মায়ের ছবি। বৃদ্ধা মহিলা। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস হবে। মাথায় কাপড়—মানে থান। গায়ে নামাবলি চাদর। হাতে মালা। আসনে বসে ছিলেন।"

কিকিরা বুঝতে পারলেন। এরকম ফোটো অনেক বাড়িতেই দেখা যায়, জীবনের শেষবেলায় তুলে-রাখা ঠাকুমা-মা-দিদিমার ছবি। ঠাকুরদা বা বাবারও হতে পারে। সব ফোটোরই ধরন প্রায় এক। হেরফের বিশেষ থাকে না।

বগলা চা জলখাবার নিয়ে এল। রেখে দিল সামনে।

জহর বলল, "এত?"

"আরে খাও।"

"এত আমি পারব না, কাকাবাবু!"

"খুব পারবে। ইয়াং ম্যান। সেই কোন দুপুরে বাড়ি গিয়ে ভাত খাবে। ওমলেট, রুটি আর দুটো মিষ্টি খেতে না পারলে হজমযন্ত্রটা শরীরে রেখেছ কেন! নাও, হাত লাগাও।"

কিকিরা নিজের চায়ের মগ তুলে নিলেন। সকালের দিকে তাঁর তিন মগ চা বাঁধা। খাদ্য যৎসামান্যই খান।

জহর যেন বাধ্য হয়েই খাবারের প্লেটটা তুলে নিল। তার আগে জল খেল গ্লাস তুলে নিয়ে।

"জহর, তোমার ওই পাঁজাবাবুর নাম কী? ...বিনয় পাঁজা?"

জহর অবাক! তাকিয়ে থাকল। "আপনি জানলেন কেমন করে! পতাকীদা বলেছে?"

“না। পতাকী কি নাম জানত?”

“কই! আমি তো নাম বলিনি। ঠিকানা বলেছিলাম আর একটা স্লিপ, টুকরো স্লিপ দিয়েছিলাম। তাতে লেখা ছিল, আমার লোক পাঠালাম, যা দেওয়ার দিয়ে দেবেন। খামের ওপর পেনসিলে শুধু মিস্টার বি. পাঁজা লেখা ছিল। ওঁর পুরো নাম বিনয়ভূষণ না, বিনয়রঞ্জন— আমি মনে করতে পারিনি।”

“মিস্টার?”

“হ্যাঁ। শ্রী লিখিনি। ...আপনি কেমন করে নাম জানলেন। চেনেন নাকি?”

“আমি কেমন করে চিনব! তোমার ফোন পেয়ে কী মনে হল, পরে একজনকে ফোন করলাম। কাছাকাছি পাড়ায় থাকে। পুরনো লোক। ক্রিমিন্যাল কেসের প্র্যাকটিস করেন। পাকা উকিল।”

“ও! ...চেনেন তিনি বিনয়বাবুকে?”

“নামে চেনেন। আলাপ নেই,” বললেন কিকিরা। জহরের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকলেন। জহর খাওয়া শুরু করেছে। চোখ সরিয়ে জানলার দিকে তাকালেন একবার। রোদ এখনও জানলার ওপারে। অনেকটা বেলায় ঘরে ঢুকবে। আবার চোখ ফেরালেন কিকিরা। বললেন, “অনেককালের পুরনো বাড়ি শুনলাম পাঁজাবাবুদের। এখন শুধু ইট ছাড়া চোখে পড়ে না কিছু।”

“ঠিকই শুনেছেন। বহু পুরনো জরাজীর্ণ বাড়ি। বাইরে থেকে ইটই চোখে পড়ে। ভেতরে নীচের তলায় খুপরি খুপরি ঘর। হরেকরকম লোক। তারা কেউ দরজিগিরি করে, কেউ স্টিলের বাসন মাথায় নিয়ে ফেরি করে পাড়ায় পাড়ায়, কারও বা হাওয়াই চপ্পলের ব্যবসা— ফুটপাথে বসে কেনাবেচা...”

“পাঁজামশাই থাকেন কোথায়?”

“দোতলায়। আমি দোতলায় দেখেছি তাঁকে। সেকালের

দোতলা, মানে যত ঘর তত প্যাসেজ! ফোটোও তুলেছিলাম দোতলার পিছন দিকের একটা ঘরের সামনে। বোধ হয় পাশেই ঠাকুরঘর।"

"তেতলায় কে থাকে?"

"বলতে পারব না। আমি তো তেতলায় উঠিনি। ওপরে কোনও শব্দও শুনিনি!"

"ফাঁকা পড়ে থাকত?"

"কী জানি! ...আমি তো ফোটো তুলতে একবারই মাত্র গিয়েছি।"

"ছবি দিতে যাওনি?"

"না। উনি এসে দোকান থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।।"

চা প্রায় শেষ। কিকিরা চুমুক দিলেন চায়ে। আলগাভাবে। বললেন, "ওঁকে একবারই দেখেছ?"

"না, না, আরও দু'-তিনবার দেখেছি। পথেঘাটে।।" জহর জল খেল আবার। চায়ের কাপ টেনে নিল। "ভদ্রলোক খুব ইন্টারেস্টিং। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, না হলে ফিনফিনে আদ্দির। পরনে মিহি ধুতি— দুইই বেশ দামি। গলায় একটা সোনায় গাঁথা পাথরের মালা। কী পাথর জানি না। হালকা নীল দেখতে। দানাগুলো ছোট ছোট। কাঁধে রঙিন চাদর। মাথার চুল ঝাঁকড়া, ফোলানো। হাতের আঙুলে অদ্ভুত সব আংটি...। লোহা, সিসে, তামা, সোনা, রুপো। বাঁ হাতে পাথর বসানো একটা বড় আংটি। কী পাথর জানি না। কালো কুচকুচে দেখতে।"

কিকিরা কৌতূহল বোধ করছিলেন। "আচ্ছা! জ্যোতিষী ভক্ত। ভাগ্য বিশ্বাসী। কী করেন উনি? ভাল কথা, বয়েসটা বললে না?"

"বয়েস হয়েছে। ফোটো তুলতে যখন গিয়েছিলাম তখন ওনার বয়েস পঞ্চাশ-টঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। এখন ষাটের মতন হবে।"

"মানে ঠিক বুড়ো নয়, প্রৌঢ়! কলসির জল গড়িয়ে খান? না, কিছু

করেন? ব্যবসাপত্র?"

জহর বলল, "তা আমি জানি না, কাকা! তবে চাকরিবাকরি করার লোক নয়। ওসব পুরনো বনেদি বাড়িতে চাকরি করার রেওয়াজ থাকে না। গোলামির ধাতই নয় ওঁদের। ব্যবসাপত্র কী করেন বা করতেন, বলতে পারব না। শুধু জানি বা শুনেছি, বীরভূমের কোথায় যেন বিস্তর জমিজমা, বাগান, পুকুর, চালকল, এটাসেটা ছিল। জমিদার বংশ।"

"আর কলকাতায়?"

"এখানেও ছিল। তবে এটা পৈতৃক। আর বীরভূমে ওঁর মাতুল বংশের বাড়ি। সেই বংশ একেবারে ফাঁকা।। বিনয়বাবুই একমাত্র জীবিত স্বজন। তিনিই মাতুলবংশের যাবতীয় সম্পত্তি ভোগদখলের উত্তরাধিকার পেয়েছেন।"

কিকিরা কেমন ধাঁধায় পড়ে গেলেন। বীরভূমে মাতুলবংশের জমিদারি আর কলকাতায় পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র মালিক।

কী ভেবে কিকিরা বললেন, "ভদ্রলোককে তুমি চিনলে কেমন করে?"

মাথা নাড়ল জহর। "সেভাবে আমি চিনি না, কাকা। বাবার সঙ্গে আলাপ ছিল। বাবার কাছে মাঝেসাঝে আসতেন। তখন দেখেছি। যেটুকু শুনছি তাও বাবার মুখে। আপনি তো জানেন, বাবা আজ প্রায় আট বছর আগে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে।"

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কিকিরা। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে একটা চুরুট ধরালেন।

শেষে কিকিরা বললেন, "পতাকীর ব্যাগ তো খোয়া গিয়েছে। বিনয়বাবুর পাঠানো ফোটো তো তুমি হাতে পেলে না। এরপর—?"

জহর মাথা চুলকে হতাশ গলায় বলল, "আমি বুঝতে পারছি না কী করব?"

"ফোটোটা যে খোয়া গিয়েছে, জানিয়েছ পাঁজামশাইকে?"

"না।"

"কেন?"

"সাহস হচ্ছে না।"

"সাহস!"

জহর ইতস্তত করে বলল, "বিনয়বাবু বারবার বলে দিয়েছিলেন, ওটা খুব জরুরি। সাবধানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। কাজটাও পনেরো দিনের মধ্যে করে দিতে হবে।" বলে একটু থেমে জহর কেমন সন্দেহের গলায়, বা খুঁতখুঁতে গলায় বলল, "আশ্চর্য কী জানেন। ফোটোটার—মানে ওটা এনলার্জ করার পর কোথায় কী রিটাচ করতে হবে তাও বলে দিয়েছিলেন।"

"মানে?"

"মানে রিটাচের সময় বাঁ চোখটা ডান চোখের তুলনায় সামান্য ছোট করতে হবে, চোখের দৃষ্টি একটু টেরা, মাথার কাপড় কপাল পর্যন্ত নামিয়ে দিতে হবে, নাক অতটা খাড়া রাখা চলবে না, গাল বসা, ভাঙা গোছের... আরও ছোটখাট দু'-চারটে ব্যাপার!"

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, "কেন?"

"সেটাই তো আমি বুঝতে পারছি না। কতকাল আগে এক বৃদ্ধা মহিলার ফোটো তুলেছিলাম—। মুখের ফোটো একেবারে নিখুঁত হয় না সাধারণত। তবু একটা মুখ নিয়ে কাজে বসলে আমরা—আমি অন্তত যেমন প্রয়োজন রিটাচ করে থাকি। বাবা অনেক ভাল পারতেন কাজটা। আমি অতটা পারি না। তবু খারাপ করি না। তা বলে, মুখের চেহারাটাই আমি দেখলাম না, মনেও নেই, উনি আমায় ফোনে কী কী করতে হবে বলে দিচ্ছেন, এটা কী ধরনের কথা!"

"তুমি কিছু বলোনি?"

"না। মুখে আসছিল, বলতে পারলাম না। বুড়োমানুষ; বাবার

সঙ্গে আলাপ ছিল একসময়। ভাবলাম, আগে তো ফোটোটা দেখি, কী অবস্থা হয়েছে সেটার, তারপর বলা যাবে। ফোটো কম-বেশি নষ্টও হয়ে যেতে পারে।"

"যত্ন করে না রাখলে হতেও পারে," কিকিরা বললেন। চুপ করে গেলেন হঠাৎ। পায়ের দিকে একটুকরো কাগজ উড়ে এসেছিল হাওয়ায়। সরিয়ে দিলেন। বাইরে রোদ বাড়ছে। উজ্জ্বল রোদ আলোর সঙ্গে তাত। বাতাস সামান্য গরম।

কিকিরা বললেন, "তুমি একটা ফোন করো পাঁজামশাইকে, বা নিজে তাঁর বাড়ি যাও। ব্যাপারটা বলো। ওঁর কথামতন কাজ যখন নিয়েছ তখন তো তোমার জানানো উচিত, ফোটোটা তুমি পাওনি, সেটা খোয়া গিয়েছে।"

"তা তো বলতেই হবে। ভাবছি, আজ ফোন করব। নম্বরটা উনি বলেছিলেন।"

"দেখো কী বলেন! ...আচ্ছা জহর, তোমার কি মনে হয়, কেউ জেনেশুনে পতাকীর কাছ থেকে ব্যাগটা হাতিয়েছে? তা যদি হয় তবে মামুলি পকেটমারের কাজ এটা নয়। টাকা-পয়সার জন্যেও ব্যাগ হাতায়নি। তার উদ্দেশ্য ছিল ওই ফোটোটা হাতিয়ে নেওয়া!"

জহর গলা ঘাড় মুছে নিল রুমালে। কিকিরাকে দেখছিল। বলল, "আমি বুঝতে পারছি না কাকা। আপনি যা বলছেন, সেরকম সন্দেহ আমারও হয়েছে। কিন্তু ভাবছি, সামান্য একটা ফোটো হাতাবার জন্যে এত কাণ্ড কে করবে? কেনই বা করতে পারে? ...আমি পতাকীদাকে বারবার জিজ্ঞেস করেছি, কেউ তাকে কিছু বলেছে কি না! কিংবা তার পিছু নিয়েছিল বলে মনে হয়েছে কি না! পতাকীদা বলছে, একটা লোক তার পিছু নিয়েছিল। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, আবার কথাটা উড়িয়ে দিতেও পারছি না। হয়তো একটা গোলমাল আছে। হয়তো...!"

"পরে সেটা ভাবা যাবে। আগে তুমি একটা ফোন করো পাঁজামশাইকে। তাঁর রি-অ্যাকশানটা দেখো। তারপর যা করার করতে হবে।"

"আপনি যদি দেখেন তার চেয়ে ভাল আর কী হবে!" জহর অনুরোধের গলায় বলল।

কিকিরা হাসলেন। সস্নেহ হাসি। "দেখা যাক...!"

তারাপদদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর জহরকে বললেন কিকিরা, "এরা অ্যামেচার। আমারই মতন। যেমন গুরু, তেমনই চেলা। তবে কাজের বেলায় অপদার্থ নয় একেবারে।" বলে হাসলেন।

জহরকে আগে কোনওদিন দেখেনি তারাপদরা। দেখার কথাও নয়। দু'জনেই দেখছিল জহরকে। একেবারে সমবয়েসি না হলেও প্রায় কাছাকাছি বয়েস। চোখমুখের চেহারাতেই বোঝা যায়, ভদ্র সাদাসিধে মানুষ। ঘোরপ্যাঁচে থাকার লোক নয়। বরং খানিকটা বেশি সরল।

পতাকী আজও দোকানে আসেনি। তবে অনেকটাই ভাল।

পাশের দোকানের একটি আধ-বুড়ো লোককে মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে জহর তার দোকান সামলে যাচ্ছে। আগামীকাল হয়তো পতাকী আসতে পারে।

কিকিরাদের দোকানে বসিয়ে জহর বলল, "কাকা, আপনারা একটু বসুন, আমি আসছি। পাঁচ-সাত মিনিট...।"

সন্ধে হয়ে গিয়েছে। এখন সাত, সোয়া সাত। দোকান বন্ধ হবে আরও ঘণ্টাখানেক পরে। আটটায়। বাইরের বড় রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড় এখনও কম নয়। তবে কমে আসছে ক্রমশ। একটা বাসের হর্ন কানের পরদা কাঁপিয়ে চলে গেল এই মুহূর্তে।

তারাপদরা দোকানের ভেতরটা দেখতে দেখতে বলল, "এ একেবারে ভেরি ওল্ড দোকান, সার। চেয়ার টেবিলগুলো পর্যন্ত সে আমলের। কাঠের বাজারে দাম আছে।"

কিকিরা নিস্পৃহ গলায় বললেন, "ওল্ড ইজ গোল্ড।"

তারাপদ মজা করে বলল, "পিওর, না খাদ মেশানো?"

চন্দন দোকানের দেওয়ালে টাঙানো কয়েকটা ফোটো দেখছিল। ফ্রেমে বাঁধানো বড় আর মাঝারি ছবি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি, একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, মড়ক বা দুর্ভিক্ষের অসাধারণ এক ফোটোগ্রাফ। আরও আছে। পুরনো হাওড়া ব্রিজ, ময়দানে দাঁড়ানো একটা ফিটন..., মায় একটা ভাঙা কলসি আর কাক, কলকাতার গঙ্গার ঘাট—। বাবুঘাট বোধ হয়।

চন্দনের কৌতূহল হচ্ছিল। কিছু ফোটোগ্রাফ এত পুরনো যে, ওসব দৃশ্য যখন তোলা হয়েছে জহর তখন জন্মায়নি, বা শিশু।

কিকিরা চন্দনকে দেখছিলেন। অনুমান করতে পারলেন সে কী ভাবছে। বললেন, "ভেরি সিম্প্‌ল ব্যাপার, চাঁদুবাবু! জহরের বাবার হাতে তোলা ফোটো অনেক, দু'-একটা আবার বাবার গুরুর, মানে যিনি হাত ধরে জহরের বাবাকে বিদ্যেটা রপ্ত করাতেন। বাকি যা দেখছ..."

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে চন্দন বলল, "আপনি দেখছি নাড়ি নক্ষত্র জানেন!"

"জানি মানে, শুনেছি। আড্ডা মারা স্বভাব, দোকানে এলে গল্প-গুজব হত—তখন শুনতাম। বিখ্যাত বিপ্লবী হেম কানুনগো

একজন মাস্টার ফোটোগ্রাফার ছিলেন, জানো?”

চন্দন মাথা নাড়ল, জানে না।

স্টুডিয়োর এটা অফিসঘর। হাতকয়েক জায়গা। টেবিল চেয়ার। একটা পুরনো আলমারি। কাচের পাল্লা। ভেতরে বিক্রিবাটার জন্যে শস্তা দু'-তিনটে বক্স ক্যামেরা, ফিল্ম রোল, বাঁধানো অ্যালবাম। ডানপাশে বোধ হয় স্টুডিয়ো ঘর। কাঠের খুপরি। ঘরের দরজা বন্ধ।

তারাপদ হঠাৎ হেসে বলল, “কিকিরা, আপনি কি কোনও সময়ে ক্যামেরা কাঁধে ঘুরতেন নাকি?”

“আমি! ...না তারাবাবু, নেভার। আমার দুটো জিনিস নেই, ধৈর্য আর তৃতীয় নয়ন।”

“সে কী, সার! আপনার তো দুটোই প্রবল।”

“ঠাট্টা করছ! ...তা হলে তো তোমাদের ভজুদার বাণী শোনাতে হয়!”

“কে ভজুদা?”

“ফিশ ক্যাচার। ছেলেবেলার, আমার ছেলেবেলার কথা বলছি, ভজুদা আমাদের পাড়ার পয়লা নম্বর ওস্তাদ ছিল মাছ ধরার। এগারোটা নানা টাইপের ছিপ, এক কৌটো বঁড়শি, সাত কিসিমের চার বানাতে পারত। ভজুদার কাছে তালিম নিতে গিয়েছিলাম। একটা পুঁটিমাছও ধরতে পারিনি। ভজুদা তখন মাথায় চাঁটি মেরে বলেছিল, তোর দ্বারা হবে না! ওরে গাধা, তোর না আছে ধৈর্য, না চোখ। না ধৈর্য, না দৃষ্টি...। ওরে ভূত, অর্জুন কি সাধে অর্জুন! চোখের দৃষ্টি একেবারে নিবাত নিষ্কম্প...। তুই গর্দভ— গো ব্যাক। ভাতের পাতে যে মাছভাজা পাবি, তুলে নিয়ে মুখে পুরগে যা। পুকুরের মাছে তোর নো চান্স।”

তারাপদ হাসতে হাসতে বলল, “সংস্কৃত বাণীটাও ভজুদার?”

"ও ইয়েস। ভজুদার ইংলিশও ছিল আমার মতন। হোম মেইড ইংলিশ।"

ওরা হেসে উঠল।

এমন সময় ফোন বাজল দোকানের। টেবিলের ওপর ফোন। কিকিরারা ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। জহর ফেরেনি এখনও। তিনি ইতস্তত করে উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন।

সাড়া দিলেন না কিকিরা। সরাসরি নয়। তবে শব্দ করলেন। কাশলেন যেন।

ওপাশ থেকে গম্ভীর গলা, "জহর...!"

কিকিরা টেলিফোনের মুখের কাছটায় হাত চাপা দিলেন। তারাপদদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন। চুপ করতে বললেন।

"উনি একটু বাইরে গেলেন; আসবেন এখনই," কিকিরা ফোনের মুখ থেকে হাত সরিয়ে সাধারণ ভাবে বললেন।

"তুমি কে?" ওপার থেকে প্রশ্ন।

"আমি ওঁর চেনা কাস্টমার। ...আমাকে বসিয়ে একটু বাইরে গেছেন দরকারি কাজে। এসে পড়বেন।"

"ঠিক আছে। আমি পরে ফোন করছি।"

"কী নাম বলব?"

"বিনয়বাবু।" ওপাশে ফোন নামিয়ে রাখলেন ভদ্রলোক।

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। "পাঁজাবাবুর ফোন।" গলায় ঈষৎ উত্তেজনা। সরে এলেন টেবিলের সামনে থেকে।

তারাপদ বোধ হয় আগেই আন্দাজ করেছিল। চন্দনের দিকে তাকাল।

"কড়া গলা নাকি, সার?" তারাপদ বলল।

"গম্ভীর।"

"হিজ মাস্টার্‌স ভয়েস?" চন্দন ঠাট্টা করে বলল।

"মেজাজ আছে।"

"তা থাক। কড়া হলে অন্যরকম মনে হত।"

ততক্ষণে জহর ফিরে এল। এসেই বলল, "আমার একটু দেরি হয়ে গেল কাকা। আসলে আমি বুলুবাবুর দোকানে গিয়েছিলাম। ওঁর বাবাকে বিকেলে নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে। হার্ট অ্যাটাক। খবর নিয়ে এলাম। পাশাপাশি সব দোকান, একসঙ্গে আছি..."

"তোমার বিনয়বাবু ফোন করেছিলেন।"

জহর যেন ঘাবড়ে গেল। "কিছু বললেন?"

"আবার ফোন করবেন।"

মাথা নাড়তে নাড়তে জহর টেবিলের সামনে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। "কাল থেকে এই নিয়ে বারচারেক হয়ে গেল। এক একবার ফোন আসে আর আমার বুক ধড়ফড় করে।"

"তুমি কাল পাঁজামশাইকে ফোন করে খবরটা জানিয়েছ তা হলে!"

"জানিয়েছি। তবে একটু ঘুরিয়ে।"

"মানে?"

"বললাম, যে-লোকটিকে পাঠিয়েছিলাম, আমার দোকানের পাতকীদা, সে ফেরার পথে অ্যাকসিডেন্ট করেছে। তার ব্যাগটা পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় হারাল..."

"অশ্বত্থামা হত ইতি গজ..."

"হ্যাঁ, এইরকম আর কী! শুনে তো উনি একেবারে আগুন। রাগে ফেটে পড়লেন। যা মুখে এল বললেন আমাকে। ....আমি তখনকার মতন ওঁকে ঠাণ্ডা করার জন্যে বললাম, আমি খোঁজখবর করছি ব্যাগটার। পতাকীদা বাড়িতে পড়ে আছে বিছানায়, নয়তো..."

"ওতে কি আর ভবি ভোলে?"

"ভুলছে না। কাল দু'বার ফোন এসেছে। আজ ও-বেলা একবার। আবার এখন একবার। আরও তো আসবে বলছেন।"

চন্দন বলল, "একটা পুরনো ফোটোর জন্যে এমন পাগলামি! ভদ্রলোকের এত হইচই করার মানেটা কী?"

দোকানের ভেতরের দরজাটা হালকা কাঠের ঠেলা-দরজা। বাইরের দিকেও একটা দরজা আছে, কাঠের। দরজা ঠেলে যে ঢুকল তার হাতে চায়ের কেটলি আর কাপ। জহরকে বলতে হল না, আগেই বলে এসেছে। কিকিরাদের চা দিল লোকটি। জহরও চা নিল।

লোকটি চলে যাওয়ার পর জহর বলল, "পতাকীদা আমায় ডুবিয়ে দিল। এখন আমি কী করব! বিনয়বাবুকে সামলাই কেমন করে!"

তারাপদ তামাশা করে বলল, "এক কাজ করুন। বাড়ির কেউ হারিয়ে গেলে লোকে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, অমুক চন্দ্র অমুক নিরুদ্দেশ। বয়েস এত, চেহারার একটা বর্ণনা...। আপনি ভদ্রলোককে বলুন—ফোটো নিরুদ্দেশের একটা বিজ্ঞাপন দিতে কাগজে।" বলে হাসল।

চন্দন বলল, "কেন! শুধু মানুষ কেন, দরকারি কাগজপত্র, চাবি, লাইসেন্স হারানোর বিজ্ঞাপনও তো কাগজে থাকে।"

জহর কোনও জবাব দেবে না ভেবেছিল। যার জ্বালা সে বোঝে, অন্যে কী বুঝবে! ওরা রসিকতা করছে করুক।

কিছু বলব না ভেবেও জহর হঠাৎ বলল, "যাঁর ফোটোর কথা হচ্ছে—তিনি অবশ্য সত্যিই নিরুদ্দেশ।"

কিকিরা একবার তারাপদদের দেখলেন, তারপর জহরের দিকে তাকালেন। "নিরুদ্দেশ। মানে মিসিং।"

"হ্যাঁ। নিখোঁজ।"

"কবে? কই, তুমি তো আগে আমায় বলোনি।"

"আমি কেমন করে বলব! জানতাম আগে?"

"জানতে না! ... কবে জানলে?"

"গতকাল," জহর বলল। চুপ করে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর কেমন হতাশ গলায় বলল, "কাল যখন উনি আবার ফোন করলেন, দ্বিতীয়বার, তখন আমি কিছু না ভেবেই বলেছিলাম, "আপনি রাগ করছেন কেন? একটা ফোটো তো! আপনি বলুন, যেদিন বলবেন, আমি আপনার বাড়ি গিয়ে তুলে আনব।... উনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, কার ফোটো তুলবে! যে-মানুষ নেই তার ফোটো তুলবে। ননসেন্স। কাজটা অত সহজ হলে আমি তোমায় পুরনো ফোটোটা পাঠাতাম না, বলতাম না—তুমি ওই পুরনো থেকে আমায় একটা এনলার্জ কপি করে দাও।"

"নেই মানে?" কিকিরা বললেন।

"মানে আমি জানি না। তবু বোকার মতন বলেছিলাম, সে কী! মারা গিয়েছেন! আমার কথা শুনে কী ভাবলেন কী জানি, শুধু বললেন, মিসিং, খোঁজ পাওয়া যায়নি।"

"মিসিং! তারপর।"

"আর কিছু বলেননি। আমিও সাহস করে অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি।"

কিকিরা বেশ অবাক। চন্দনদের দিকে তাকালেন। তারাও বোকার মতন বসে আছে। বুঝতে পারছে না ঠিক কী হয়েছে, হতে পারে।

এমন সময় ফোন বাজল।

ফোন তুলল জহর।

"হ্যাঁ, জহর বলছি।"

ওপাশ থেকে বিনয়বাবুই কথা বলছেন। কী বলছেন কিকিরা

শুনতে পাচ্ছিলেন না ; শোনার কথাও নয়। জহর শুধু সাড়া দিয়ে যাচ্ছিল।

সামান্য পরেই ফোন রেখে দিল জহর।

"পাঁজামশাই ?"

"হ্যাঁ।"

"কী বললেন ?"

"বললেন, কাল বিকেলে উনি নিজেই আসবেন দোকানে। অনেক খুঁজে একটা নেগেটিভ তিনি পেয়েছেন। অন্য নেগেটিভ। পড়ে থেকে থেকে ফেড হয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে যাওয়াই সম্ভব। তবু সেটা নিয়ে তিনি আসবেন, যদি কাজে লাগে।"

তারাপদ হঠাৎ বলল, "তা আগে এলেই তো পারতেন।"

জহর বলল, "উনি অসুস্থ মানুষ। বয়েস হয়েছে। কী করে বুঝবেন যে-ফোটোটা পাঠাচ্ছিলেন সেটা হারিয়ে যাবে ওভাবে।"

"উনি অসুস্থ। কী অসুখ ?" কিকিরা জানতে চাইলেন।

"আমি তো শুনলাম, সবসময় মাথা ঘোরে। বললেন, ভারটিগো।"

"ভারটিগো!" চন্দন বলল, "ভারটিগো সাধারণত ঘোরানো সিঁড়ি-টিড়ি উঠতে গেলে হয়, খুব উঁচু জায়গায় গিয়ে নীচে তাকালেও হয়। আরও নানা কারণে হতে পারে। উনি কি হাইপার টেনশান—মানে হাই ব্লাড প্রেশারে ভোগেন ?"

অসহায় মুখ করে জহর বলল, "আমি জানি না। হতে পারে..."

কিকিরা কী যেন ভাবছিলেন। চোখ বুজে ডান হাতটা কপালে রেখে বসে থাকলেন। খানিকটা পরে চোখ খুললেন। বললেন, "শোনো উনি কাল আসছেন আসুন। ভালই হল। আমিও আসব। তবে দোকানে নয়। উনি যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ নয়। তার বদলে একটা জিনিস আমি রেখে যাব।" বলে কিকিরা হাত বাড়িয়ে

টেবিলের একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখালেন। "শোনো জহর, কাল একসময়—এই বেলার দিকে এসে আমি তোমার টেবিলেই ওই জায়গায় একটা ডেস্ক পেন্-হোল্ডার রেখে যাব। ছ' সাত ইঞ্চি লম্বা। হোল্ডারের মাঝখানে একটা ছোট ঘড়ি। টেব্‌ল ঘড়ি। দেখতে কালো, ছোট, হালকা, স্মল পিস। ঘড়িটার দু' পাশে দুটো খোপ আছে। একটাতে পেন-হোল্ডার—মানে কলম রাখার ব্যবস্থা, অন্যটায় পেপার-কাটার, ক্লিপ এ-সব। আসলে টেব্‌ল ঘড়ি হলেও এটা কিন্তু টেপ রেকর্ডার। পেন হোল্ডারের মুখটা আসলে মাইক। তলায় টেপ আর ব্যাটারি রাখার ব্যবস্থা। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। জাপানি মাল তো, পাক্কা অ্যারেঞ্জমেন্ট। ফ্যান্সি মার্কেট থেকে কিনেছিলুম। ... আমার কাছে এরকম দু'-একটা জিনিস আরও আছে, অন্য কায়দার। তবে সেগুলোয় এখানে সুবিধে হবে না। ঘড়িটাই একদম মানিয়ে যাবে।"

তারাপদরা কিকিরার বাড়িতে হরেকরকম পুরনো নতুন, নানান ধরনের জিনিসপত্র দেখেছে। এসব তাঁর জমিয়ে রাখার শখ। ওরা অবাক হল না।

জহর বলল, অবাক হয়েই, "ঘড়ি নিয়ে আমি কী করব, কাকা?"

"তুমি কী করবে আর! সময়মতন চালু করে দেবে। কেমন করে দেবে আমি দেখিয়ে দেব। ভেরি ইজি ব্যাপার।"

"তারপর?"

"পাঁজাবাবুকে যা বলার বলতে দেবে। তুমি চেষ্টা করবে তাঁকে দিয়ে বেশি কথা বলাবার।"

"মানে?"

"মানে যতটা পারো নিরুদ্দেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে। কোথায় কবে কেমন করে নিরুদ্দেশ হলেন মহিলা? এতকাল পরে ফোটোটা এনলার্জ করার দরকার পড়ল কেন? কী হবে এনলার্জ

করিয়ে? অত রিটাচ্ করারই বা দরকার কেন?”

“ফোটোই হল না, তো রিটাচ্।”

“যদি ওঁর নেগেটিভ থেকে হয়?”

“কিন্তু কাকা, এসব ওঁর ফ্যামিলির ব্যক্তিগত ব্যাপার। বলবেন কেন?”

“না বলতেও পারেন! আই অ্যাডমিট।

“তবে?”

“জহর! আমি পাঁজামশাইকে দেখিনি। তাঁর সম্পর্কে জানি না কিছু। তবু তোমায় বলছি, ভেতরে কোনও বড় রহস্য আছে। সাম্ মিস্ট্রি। নয়তো এতকাল পরে ভদ্রলোক ফোটো নিয়ে এত ব্যস্ত, উতলা হতেন না।”

জহর চুপ করে থাকল।

কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। তারাপদরাও যেন গন্ধ পাচ্ছিল রহস্যের।

“আমরা এখন উঠি,” কিকিরা বললেন জহরকে। “ঘাবড়ে যেয়ো না। কাল আমি যথাসময়ে তোমার স্টুডিয়োর কাছাকাছি হাজির থাকব। দেখাও হবে। নার্ভাস হবে না একেবারে। চলি।” কিকিরা উঠে পড়লেন।

হালদার স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে কিকিরা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

কলকাতা শহরে কদাচিৎ বসন্তকালের মোলায়েম ফুরফুরে স্নিগ্ধ

হাওয়া অনুভব করা যায়। এখন যে হাওয়া দিচ্ছিল তা মনোরম, খানিক এলোমেলো। ফুটপাথের পাশেই পুরনো এক গির্জা, সামান্য ফাঁকা মাঠ, কয়েকটা সাবু গাছ।

"ক'টা বাজল, চাঁদু?"

চন্দন ঘড়ি দেখল হাতের। "সাড়ে সাত বেজে গিয়েছে।"

কিকিরা একবার আকাশের দিকে তাকালেন। পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনও তিথি। দ্বাদশী ত্রয়োদশী হবে।

"ভাবছি একবার পানু মল্লিকের কাছে যাব৷"

"ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার?" তারাপদ বলল।

"ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার আবার কী হে! ক্রিমিন্যাল কেসের প্র্যাকটিস করেন।"

"ওই হল!... তা তাঁর কাছে কেন?"

"পানুদাকে বলেছিলাম, আপনার পাড়ার কাছাকাছি পাঁজামশাই থাকেন, একটু খবরাখবর নেবেন।"

"ও! কোথায় থাকেন আপনার পানু মল্লিক?"

"কেশব সেন স্ট্রিট।" বলেই হাত বাড়ালেন কিকিরা, "দেখি একটা ফুঁ দাও তো!" ফুঁ মানে সিগারেট। কিকিরা নিজের মনেই বললেন, "পানুদার ঠিকানা কেশব সেন স্ট্রিট হলেও ওঁর বন্ধুবান্ধব আড্ডা থিয়েটার ক্লাব— বরাবরই বউবাজারের দিকে ছিল।"

সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে তারাপদ বলল, "এখন যাবেন। বেটাইম হয়ে যাবে না। গিয়ে হয়তো দেখবেন, ভদ্রলোক মক্কেল নিয়ে বসে আছেন। উকিল আর ডাক্তার— সন্ধেবেলায় কামাই দেয় না শুনেছি। টাকা কামাবার টাইম ওটা।" বলে চোখ টেরা করে চন্দনকে দেখল।

চন্দন পাত্তাই দিল না তারাপদকে, কথাটা যেন তার কানেই যায়নি। "আপনি একা যাবেন তো চলে যান, আমরা কেটে পড়ি।"

“তা হয় না। তোমরাও চলো। ...আরে আমি বুড়োমানুষ, অর্ধেক কথা মাথায় আসে না, যা শুনি ভুলেও যাই। চলো।”

“আমাদেরও টেনে নিয়ে যাবেন!”

“বা, তোমরাই তো আমার কমান্ডো।”

তারাপদরা হেসে উঠল।

কিকিরা নজর করে ফাঁকা ট্যাক্সি দেখছিলেন। পেয়েও গেলেন একটা।

ট্যাক্সিতে বসে কিকিরা হঠাৎ বললেন, “চাঁদু, তোমাদের ডাক্তারিতে কী বলে! এমন তো অনেক সময় দেখো, আপাতত, গোড়ায় গোড়ায় যে রোগটাকে সিম্পল বলে মনে করছ, পরে দেখলে সেটা ভীষণ জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ঠিক কি না?”

চন্দন মাথা হেলিয়ে বলল, হয়।

“আমার সন্দেহ হচ্ছে, পাঁজাবাবুর কেসটা জলবৎ নয়।”

তারাপদ বলল, “সার, জলবৎ না জটিলবৎ সে-কথা বাদ দিন। এই কেসটা তো আপনাকে কেউ নিতে বলেনি। ক্লায়েন্ট নেই। তবু নিজেই আপনি নাক গলাচ্ছেন।”

কিকিরা বললেন, “আমার যে স্বভাব ওইরকম। নেই কাজ তো খই ভাজ।” বলে হেসে উঠলেন।

পানু মল্লিক নীচেই ছিলেন। তাঁর বাড়ির চেম্বারে। এক মক্কেলকে সবেই ঘর থেকে সরিয়েছেন, কিকিরা মুখ বাড়ালেন।

“আরে কিঙ্কর!”

“আসব?”

“ন্যাকামি কোরো না। এসো।”

“আপনার আরেক মক্কেল বাইরে বসে আছে।”

“কালী!” পানু মল্লিক ডাকলেন।

ঘরের একপাশে আধ-বুড়ো একটি লোক টাইপ মেশিন আর কাগজপত্র নিয়ে বসে ছিল। কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

পানু মল্লিক বললেন, "বাইরে বলরাম শীল বসে আছে। তাকে বলে দাও, কাল কোর্টে গিয়ে যেন দেখা করে। জজসাহেবকে কাল পাব না। এ হপ্তায় কাজের কাজ কিছুই হবে না। সবুর করতে হবে ক'টা দিন।"

কালী চলে গেল।

পানু মল্লিক কিকিরাদের বসতে বললেন। "ও দুটি তোমার নন্দীভৃঙ্গী নয়!"

কিকিরা হাসলেন। তারাপদদের চেনেন পানু। চোখের চেনা।

দু'-চারটে সাধারণ কথা। তারপর কিকিরা বললেন, "আমার সেই পাঁজামশাই, বিনয় পাঁজার খোঁজ নিয়েছেন?"

"নিয়েছি কিছু কিছু। ...আরে ওই ভদ্রলোক তো এখন লাটে উঠে বসে আছেন। টোটালি ডুবে গিয়েছেন।"

"মানে!"

"আমি শুনলাম, ভদ্রলোক দেনায় দেনায় মাথা ডুবিয়ে বসে আছেন। সবচেয়ে বড় দেনা হল, তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে বারো কাঠা জমি— ওইরকম হবে, একটা লোককে মর্টগেজ দেন। জমির মালিকানা ছিল বিধবা মায়ের নামে। সত্তর আশি হাজার টাকায় মর্টগেজ ছিল। সুদ ধরা ছিল টাকার ওপর। এখন সুদ সমেত তার পাওনা ছ'-সাত লাখ টাকা।

তারাপদ আঁতকে উঠে বলল, "ছ'-সাত লাখ!"

"কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হলে হতেই পারে। তার ওপর ওই জমিতে একটা ছোট সিনেমা হল তৈরি করেছিলেন— ওই ভদ্রলোক— যিনি টাকা ধার দেন। বছর কয়েক হল— সিনেমা বন্ধ। চলছে না।"

"কেন?"

"জানি না। ...ওসব থার্ডক্লাস হল আর চলে না বলেই বোধ হয়।"

"এ ছাড়া!"

"বরানগরের দিকে একটা বাজার ছিল। লিজ দিয়েছিলেন। সেটাও হাতছাড়া হয়েছে।

"আর?"

"আরও ছিল। চিৎপুরের দিকে একটা বাড়ি ছিল। বারো ভাড়াটের বাস। তারা ভাড়া তো দেয়ই না, বাড়ির মালিকানাও মানতে চায় না। কোর্ট দেখিয়ে দেয়।"

"আশ্চর্য!"

"ধুস, এতে আবার আশ্চর্য হওয়ার কী আছে! কলকাতা শহরের কত পুরনো বাড়ির এই হাল— তোমরা তার খোঁজ পাবে কেমন করে!"

কিকিরা চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন, "শুনেছি, বীরভূমের দিকে পাঁজামশাইয়ের মাতুল বংশ। ওদিকেও ফাঁকা। সেখানে জমি জায়গা বাগান পুকুর..."

"জানি না কিঙ্কর। আমার কাছে তেমন খবর নেই। বীরভূমের দিকে মায়ের বাপের বাড়ি ছিল শুনেছি। তবে জমিজমা বাগান সত্যি কতটা ছিল— আর থাকলেও শেষ পর্যন্ত মায়ের বাপের বাড়ির সম্পত্তি ওঁর হাতে এসেছিল কি না, বলতে পারব না। খোঁজ করার উপায় আমার নেই।" বলতে বলতে পানু মল্লিক আয়াস করে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। "কালী, এদের চা কী হল? বাড়ির মধ্যে বলেছ?"

কালী বলল, বলে এসেছে।

"কিঙ্কর?"

"বলুন পানুদা?"

"ব্যাপারটা কী হে? তুমি হঠাৎ পাঁজা নিয়ে পড়লে কেন?...

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নেই, তবে দেখেছি লোকটিকে। প্রায় বুড়ো, ষাট-বাষট্টি তো হবেই। বনেদি চেহারা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন। মাথার চুল বারো আনাই সাদা। পথেঘাটে বড় একটা চোখেই পড়ে না। শুনেছি নিজের ওই বাড়ি ছেড়ে বেরোন না একরকম। ওঁর আপাতত কোনও সংসারও নেই। মেয়ে-জামাই বিদেশে।"

কিকিরা মন দিয়ে পানুবাবুর কথা শুনছিলেন। যত শুনছিলেন ততই যেন ধাঁধায় পড়ে যাচ্ছিলেন।

কাঠের ট্রে করে চা নিয়ে এল একটি ছোকরা।

"নাও চা খাও," পানুবাবু বললেন। "ব্যাপারটা কী আমায় একটু বলবে?"

কিকিরা মাথা হেলালেন। চায়ের কাপ তুলে নিলেন টেবিল থেকে, তারপর সংক্ষেপে বললেন ঘটনাটা।

পানু শুনলেন। ভাল উকিলের চোখ কান যেন অনেক বেশি সতর্ক ও তীক্ষ্ণ হয়। বিশেষ করে ক্রিমিন্যাল প্র্যাকটিস নিয়ে যাদের দিন কাটে মাসের পর মাস।

কিকিরা চুপ করলেন। চন্দন আর তারাপদ কোনও কথাই বলেনি। তারা নেহাতই যেন সঙ্গী। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিল, ওদের উদাসীন ভাব দেখে, বিষয়টা নিয়ে কিকিরার যত উৎসাহই থাক তাদের বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই।
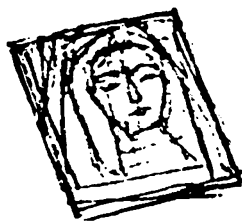
পানু মল্লিক একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন। তারপর বললেন, "কিঙ্কর, যত চোর গুণ্ডা বাটপাড় খুনে নিয়ে আমার দিন কাটে। এক্সপিরিয়ান্স কী কম হল! দেখলাম অনেক। হাই লেভেল লো লেভেল— কোথায় ক্রিমিন্যাল নেই! এভরি হোয়ার। পেশাদারি ভাবে কথার প্যাঁচে অনেককে বাঁচিয়েছি, অনেকের জন্যে সরকারি খানাদানার ব্যবস্থা করেছি দু'-চার বছরের জন্যে। ...তা সে-কথা

থাক। আসল কথাটা কী জানো ভায়া, ক্রিমিন্যালরা দু'-ক্লাসের হয়। মেইনলি। একটার কাজকর্ম হয় অনেকটা সরল গতির। এরা মূর্খ, টেম্পারামেন্টাল, গবেট। আর-এক ক্লাসের ক্রিমিন্যাল দেখেছি, তারা যত চতুর ততই জটিল। এদের হল বক্রগতি। ধরাই যায় না, বেটারা সত্যিই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, না, এক-একটা ভয়ঙ্কর শয়তান।...আমি পাঁজামশাই সম্পর্কে আগে থেকে কোনও কমেন্ট করব না। কিন্তু তুমি যদি ওঁকে নজরে রাখো হয়তো সত্যি-মিথ্যে অনেক কিছু জানতে পারবে।...আর শোনো, আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করব। জানাব তোমায়।"

কিকিরা উঠে পড়লেন। "চলি পানুদা। আপনি যা বলেছেন আমি তার সঙ্গে একমত।"

চন্দনরাও উঠে পড়ল।

রাস্তায় এসে চন্দন হঠাৎ বলল, "কিকিরা আমাদের হাসপাতালে বীরভূমের একটি ছেলে আছে। আমার কলিগ। বীরভূমের খোঁজ আমি নেব।"

দুটো দিন কেটে গেল।

কিকিরা আশা করেছিলেন, জহরের টেবিলে যে যন্ত্রটি রেখে এসেছিলেন—সেই গোপনে রাখা টেপ রেকর্ডার থেকে বিনয় পাঁজার মুখে তাঁর নিজের তরফের কথা অনেকটাই জানা যেতে পারে।

পাঁজামশাই কম কথার মানুষ। জহরও ততটা চতুর নয়, তার সেই

বুদ্ধি আর তৎপরতাও নেই যে খুঁচিয়ে ভদ্রলোকের মুখ থেকে, বলা ভাল পেট থেকে, দশটা কাজের কথা বার করে নেবে। জহর পারেনি।

ওরই মধ্যে কাজের কথা যা জানা গিয়েছে, তা হল—বিনয়বাবু তাঁর মা আর বাড়ির কাজকর্মের দু'-তিনজনকে নিয়ে সে-বছর হরিদ্বার হৃষীকেশ যান। ওই পথে যতটা পারেন যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। তখনও ঠিক বর্ষা পড়েনি। গরম শেষ হয়ে আসছে। বিনয়বাবু আগে থেকেই কোথায় কোথায় উঠবেন সে-ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সবই প্রায় কোনও-না-কোনও আশ্রম। বিনয়বাবুদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত, দু'পুরুষ তো হবেই। তীর্থযাত্রীদের জন্যে ধর্মশালা বা ওইরকম কিছু তো আছেই। তা তীর্থযাত্রার মধ্যে একদিন হঠাৎ দুর্যোগ দেখা দিল। আচমকা। দুপুর থেকে বৃষ্টি। বিকেল-শেষে সেই বৃষ্টি প্রবল হল; তার সঙ্গে ঝড়। অন্ধকারে ডুবে গেল পাহাড়পর্বত গাছপালা। কিছুই আর ঠাওর করা যায় না।

তখন ঘন রাতও নয়,—বৃষ্টি পড়েই চলেছে, হঠাৎ সব কেমন দুলে উঠল। ভীষণ এক শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে রটে গেল ভূমিকম্প। তখন মাথা ঠাণ্ডা রাখার মতন মানুষই বা ক'জন! প্রাণের ভয়ে কে যে কীভাবে মাথার আশ্রয় সাধারণ ধর্মশালা ফেলে বাইরে বেরিয়ে পাগলের মতন ছোটাছুটি শুরু করল বোঝানো মুশকিল।

পাঁজাবাবুর পরিবারের একজন সেই দুর্যোগে চিরকালের মতন হারিয়ে গেলেন। পাঁজাবাবুর বৃদ্ধা মা। বৃদ্ধা হলেও একেবারে অক্ষম বা পঙ্গু নন।

কোথায় হারালেন?

সম্ভবত দিকদিশা পথ ঠিক করতে না পেরে ওই বৃষ্টি আর অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ি সরু পথের কিনারা থেকে গড়িয়ে পড়েছিলেন নীচে। গভীর কোনও খাদে। সেখান থেকে কাউকে

উদ্ধার করা অসম্ভব। ঘন গাছপালায় পাথরে মাটিতে অন্ধকার একেবারে। কোন অতলে নেমে গিয়েছে সেই খাদ কে জানে। তার ওপর ধস নেমেছিল কোথাও কোথাও। বৃষ্টি তো ছিলই।

যাই হোক, পরের দিন বিকেলে আবহাওয়া খানিকটা ভাল হলেও ওঁর খোঁজ করা সম্ভব হয়নি। তার পরের দিন উন্নতি হল আবহাওয়ার। বৃদ্ধার খোঁজ করা হল। পাওয়া যায়নি। সকলেরই ধারণা হল, উনি মারা গিয়েছেন, দেহটা কোথায় চাপা পড়ে আছে জানা সম্ভব নয়।

ঘটনাটা ঠিক পাঁচ বছর আগেকার।

আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সময়ের প্রায় বছরখানেক আগে বিনয় পাঁজা জহরকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে বৃদ্ধার ফোটোটি তুলিয়েছিলেন। উনি কী করে জানবেন, জানা সম্ভব যে, বছরখানেকের মধ্যে এই পরিণতি হবে মায়ের।

কিকিরা যেন একটা বিদঘুটে অঙ্ক নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন ; কোন পথে যাবেন বুঝতে পারছেন না, নিজের ওপরেই অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিলেন, এমন সময় ছকু এসে হাজির। গুরুজির তলব, না এসে সে থাকতে পারে!

ছকু এসে যথারীতি গড় হয়ে কিকিরার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, তারপর হাতকয়েক তফাতে মাটিতে বসল। গুরুজির সামনে কোনওদিনই সে উঁচু জায়গায় বসে না।

"তোমায় আরও আগে খবর দিলে হত।" কিকিরা বললেন, "মাথায় এসেছিল একবার, কিন্তু ভাবলাম আগে থেকে খবর না দিয়ে এদিকের ব্যাপারটা বুঝে নিই আগে।"

"খবর ভেজলেই চলে আসতাম," ছকু বলল। "কোই কাম আছে, গুরুজি?"

"আছে। আগে বলো তোমার বাড়ির সব ভাল?"

"বালবাচ্চা ভাল। বহুকে থোড়া ম্যালারু ধরেছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।"

কিকিরা হাসলেন। পরে বললেন, "ছকু, তুমি তো বড় ওস্তাদ ছিলে। এদিকেই আগে তোমার কারবার ছিল। এখন পাড়া পালটেছ, পেশাও পালটে ফেলেছ অনেকদিন।"

ছকু যেন লজ্জার মুখ করে হাসল।

"আচ্ছা, একটা কথা বলতে পারো? ধর্মতলার লাইনে তোমার পুরনো চেলা কে কে আছে এখনও?"

ছকু একসময়ে পকেটমারদের মাস্টার ছিল। ভাল ট্রেনার। হাতে-কলমে কাজ শিখিয়েছে। তখন সে মাস্টার ওস্তাদ। এখন সে অন্য পাড়ায় লন্ড্রির দোকান দিয়েছে। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প টেলারিং। এখনও তার চেলা আছে। তারা মাস্টার বলে ডাকে ছকুকে। ছকু নিজে পকেটমারের মতন ইতর কর্ম নিজে করে না। তবে চেলাদের ছোটখাটো টিপ্‌স দিতে আপত্তি কীসের!

ছকু বলল, "আছে। কেন গুরুজি?"

"আমার একটা কাজ করতে হবে।"

"হুকুম করুন।"

"একটা লোকের খোঁজ দিতে পারবে?"

"ক্যায়সা লোক?"

কিকিরা সেদিনের ঘটনার কথা বললেন। যে-লোকটা পতাকীর ব্যাগ উঠিয়ে নিয়ে গলির মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল তার একটা বর্ণনাও দিলেন যতটা পারেন। আচমকা ঘটনা; মন দিয়ে নিখুঁতভাবে সব দেখার মতন অবস্থা তখন নয়, তবু, যতটা পেরেছেন দেখেছেন কিকিরা। ছোকরার গায়ে ছিল চাকার মতন গোল গোল লাল-সাদা ছাপ তোলা গেঞ্জি, ঘোড়ার মাঠের জকিদের মতন অনেকটা। মাথার

চুলের সামনেটা সাপের মতন ফণা তোলা। লম্বা জুলফি।

ছকু সব শুনল। ভাবল কিছুক্ষণ। পরে বলল, "লাইনে নয়া নয়া ছোকরা চলে আসছে গুরুজি। আপনি যার কথা বললেন, আমি ওকে চিনি না। নয়া ছোকরা হবে। তো আমার পুরানা দোস্তরা আছে এখানে, পাত্তা নিয়ে নেব।"

কিকিরা বললেন, "ছকু, আমি জানতে চাই, যে-লোকটা রাস্তা থেকে ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে পালাল, সে সত্যিই ওই এলাকার পকেটমার, না, অন্য মতলব ছিল তার।"

ছকু বুঝতে পারল। আসলে লোকটা মামুলি পকেটমার, না, তাকে কেউ ওই কাজের জন্যে ভাড়া খাটাচ্ছিল—জেনে নিতে চান গুরুজি।

কাজটা সহজ। ছকু জেনে নেবে। কলকাতা শহরের প্রত্যেকটি এলাকায় সেখানকার পকেটমারদের ঘাঁটি থাকে। ঘাঁটির বাদশাও থাকে—মানে লিডার, কর্তা। তার হুকুম না মানার মতন বুকের পাটা কারও হয় না।

"তুমি তাড়াতাড়ি খবর নিয়ে আমায় জানাবে।"

ছকু মাথা নাড়ল। হয়ে যাবে কাজ।

আরও খানিকটা বসে চা খেয়ে ছকু চলে গেল।

বিকেলে চন্দন এল।

"তারা আসেনি?"

"এখনও নয়। আসবে।"

চন্দন রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল, "কী গরম পড়ে গেল, সার! চৈত্র মাস কি শুরু হয়ে গিয়েছে! দেখতে দেখতে টেম্পারেচার..."

"জল খাও!" বলেই হাঁক দিলেন কিকিরা, বগলাকেই।

চন্দন একবার পাখাটার দিকে তাকাল। জোরেই চলছে। নিজের জায়গাটিতে বসতে বসতে চন্দন বলল, "আপনাকে বলেছিলাম না, হাসপাতালে আমার এক কলিগ রয়েছে বীরভূমে বাড়ি। সজল নাগ।"

"নাগ...! হ্যাঁ, বলেছিলে।"

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিনয় পাঁজাকে চেনো কি না?"

"নাগ কি পাঁজামশাইয়ের দেশের লোক! বীরভূম তো একটা জেলা। পাঁজামশাইদের জমিদারির চৌহদ্দি ছিল কোন দিকটায়?"

"দিকটিক জানি না, সার। বীরভূম আমার ডিস্ট্রিক্ট নয়," চন্দন বলল। "সজল বীরভূম জেলার ছেলে। নলহাটির দিকে তার বাড়ি। সে বলল, পাঁজাদের সে চেনে না। তবে নাম শুনেছে। ডুমুরগ্রাম বলে একটা জায়গা আছে ওদিকে। পাঁজারা সেখানকার লোক। মানে পাঁজার মামার বাড়ি ওখানে। চৌধুরীবাড়ি।"

বগলা জল নিয়ে এল।

জল খেয়ে চন্দন বলল, "ইন ফ্যাক্ট, ডুমুরগ্রাম—পাঁজাবাবুর মামার বাড়ি বেশ বিখ্যাত। মামাদের একসময় জমিদারি-টমিদারি ছিল। তবে জমিদারদের এখন আর দাপট কোথায়! ওই লুকিয়েচুরিয়ে বেনামা করে যা রাখতে পেরেছে তাতেই পেট চলে। অবশ্য পাঁজাবাবুর মামার বাড়ির অতটা দীনদশা হয়নি। দু' মহলা ভাঙা বাড়িটা আছে। দু' মহলা হলেও বাড়ি বিশাল। কাছারি, দেউড়ি, ঠাকুর দালান সবই আছে। আছে মদনমোহনের মন্দির। দেবোত্তরের আয় থেকে বছরের দুর্গাপুজোটাও হয় এখনও..."

"কে থাকে ওখানে?"

"কেউ নয়। জনাদুই কর্মচারী আর একজোড়া বাস্তু সাপ। চন্দন হাসল। "বারোয়ারি লোকজনও ঢুকে পড়ে।"

কিকিরা যেন চোখ বুজে অনুমান করার চেষ্টা করলেন ডুমুরগ্রামের জমিদার বাড়িটা।

"চাঁদু, আমাদের বুঝতে একটু গোলমাল হচ্ছিল। একেবারে সঠিক করে বলতে গেলে বলতে হয়, বিনয়বাবুর পৈতৃক বাড়ি কলকাতায়, ঠনঠনিয়ার দিকে— যেখানে এখন তিনি আছেন। এটা তাঁর নিজস্ব। আর ওই বীরভূমের বাড়ি এটা-ওটা যা রয়েছে সব তার মামার বাড়ির। ভদ্রলোকের কপালে ছিল তাই মামার বাড়ির প্রপার্টি— যাই হোক না কেন— ইনহেরিট করেছেন। ঠিক তো!"

"পুরোপুরি ঠিক।"

"প্রশ্ন হচ্ছে, বিনয়বাবুর মামার বংশে এমন কেউ কি ছিল না যে-লোক সম্পত্তির ভাগীদার হতে পারে? অন্তত পার্টলি? ...কী বলে তোমার কলিগ?"

চন্দন বলল, "সার, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা। সজল বলল, আর-একজন ছিল। তবে তার থাকা না-থাকা সমান।"

কিকিরা কৌতূহল বোধ করলেন। বললেন, "কে?"

"ও-বাড়ির একটি ছেলে। বিনয়বাবুর মাসতুতো ভাই। ঘটনা হল, বিনয়বাবুর মায়েরা দু'বোন। ভাই নেই। বিনয়বাবুর মা—বোনদের মধ্যে বড়। ছোট বোন বয়েসে খানিকটা ছোট তো বটেই, কপালটাও খারাপ। কম বয়েসে বিধবা হন। মায়ের কাছেই অবশ্য থাকতেন। একটি ছেলে ছিল। তা একদিন ছেলেটির দিদিমা আর মা দুই-ই চলে গেলেন। ছেলেটা খেপাটে গোছের। ঘরবাড়ির সঙ্গে আলগা সম্পর্ক। সাধু-সন্ন্যাসী শ্মশান-মশান করে বেড়াত। শেষে বিশ-বাইশ বছর বয়েসেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। পরে শোনা গেল সে কোনও তান্ত্রিকের দলে গিয়ে ভিড়েছে।"

অবাক হয়ে কিকিরা বললেন, "সে কী! জমিদার বাড়ির ছেলে তান্ত্রিক!"

"চমকে যাচ্ছেন সার! চমকাবার কিছু নেই। সজল বলে, বীরভূমের রক্তে নাকি দুটো জিনিসেরই টান আছে। একদিকে বৈষ্ণব, অন্যদিকে তন্ত্র। একদল বাজায় একতারা, অন্যদল শ্মশানের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়।"

কিকিরার কৌতূহল ততক্ষণে তীব্র হয়েছে। বললেন, "একদিকে জয়দেব, অন্যদিকে বামাক্ষ্যাপা! তা পাঁজাবাবুর মাতুলবংশ কি..."

"ঘোরতর বৈষ্ণব।"

"বৈষ্ণববংশের ছেলে হয়ে গেল তান্ত্রিক।"

"সজল তো তাই বলে।"

"চাঁদু, এ তো দেখছি সেই ভক্তকুলে দৈত্য।"

তারাপদর গলা পাওয়া গেল। বগলার সঙ্গে কথা বলছে।

কিকিরা বললেন, "চাঁদু, সেই তান্ত্রিকের আর খবর পাওয়া যায়নি। পরে কখনও বাড়িঘর ভিটেতে দেখা যায়নি তাকে?"

"না," চন্দন বলল। বলে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল। বলল, "সার, একটা কথা মনে রাখবেন। সজল ওই পাঁজাবাবুর মামার বাড়ির গ্রামের মানুষ নয়, তাদের বাড়ি নলহাটির দিকে। সে যা শুনেছে এ-মুখ সে-মুখে— তাই বলেছে। কোনটা কতদূর সত্যি, কোনটা লোকমুখে বানানো— তা সে জানে না।"

কিকিরা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, "চাঁদু, আমার বুদ্ধিতে বলে, সামান্য ধোঁয়া দেখলেও অনুমান করতে হবে আগুন অল্পস্বল্প আছে কাছাকাছি; এখানে একটু ধোঁয়া দেখছি, কিন্তু আগুন...?"

তারাপদ ঘরে এল। শেষ কথাটা তাঁর কানে গিয়েছে। বলল, "কীসের ধোঁয়া সার?"

"ধুনির," কিকিরা হালকা স্বরে বললেন।

"ধুনি! কার ধুনি? কোথায়?" বলে তারাপদ চন্দনের দিকে তাকাল। তাকিয়ে নিজের মাথা দেখাল। "অফিস থেকে বেরিয়ে

ও-পাড়ার মডার্ন হেয়ার কাটিংয়ে একটা হেয়ার কাট দিলুম। শ্যাম্পুও করিয়ে নিলুম। কেমন হয়েছে রে?"

চন্দন গম্ভীর মুখে বলল, "কুমারটুলির কার্তিক!"

"যাঃ!" তারাপদ যেন খুশি হল না, মুখের ভাবে হতাশ হওয়ার ভান করে বলল, "তোর চোখ বলে কিছু নেই। দারুণ ছেঁটেছে।"

"তো ছেঁটেছে। বোস।"

বসল তারাপদ। মাথার চুলে শ্যাম্পুর গন্ধ। সাবধানে একবার মাথায় হাত বুলিয়ে গন্ধটা শুঁকল। "কীসের ধুনি, সার? কার কথা বলছিলেন?" কিকিরার দিকে তাকাল তারাপদ।

কিকিরা বললেন, "চাঁদুকে জিজ্ঞেস করো। ...তুমি শোনো, আমি একটা ফোন সেরে নিচ্ছি।"

চন্দন ডুমুরগ্রামের বৃত্তান্ত শোনাতে লাগল তারাপদকে।

কিকিরা হালদার স্টুডিয়োতে ফোন করলেন। বার দুই বৃথা চেষ্টা। কথা চলছিল ওপাশে। তিনবারের বার পেলেন।

"জহর! রায়কাকা বলছি। পতাকী আসছে?"

ওপার থেকে সাড়া এল। "এসেছে। ভালই আছে।"

"গুড। ...ইয়ে তোমার সেই নেগেটিভের কী হল? পাঁজামশাই পরে যেটা দিয়েছিলেন?"

"ও কিছু হবে না। নষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

"চেষ্টা করেছিলে?"

"চেষ্টা করেও হল না। একটা কালচে দাগ আর বাদবাকি একেবারে ধোঁয়া। দেখলে মনে হবে ভুতুড়ে..."

"ও! বিনয়বাবুকে জানিয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"কী বললেন?"

"কী আর বলবেন! বললেন, জানতাম।"

"অল্পক্ষণ চুপচাপ। তারপর কিকিরা বললেন, "কাল তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি যাব।"

ফোন রেখে দিয়ে কিকিরা তারাপদদের দিকে তাকালেন। চন্দন আর তারাপদদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল না আর। যা বলার বলা হয়ে গিয়েছে চন্দনের।

বগলা এসে চা দিয়ে গেল। কিকিরা নিয়ম করেছেন, এখন থেকে যেহেতু গরম পড়ে যাচ্ছে, গরমের বদলে ঠাণ্ডা চা খাওয়া হবে। মানে হালকা চা, দুধ থাকবে না, চিনি সামান্য, আর চায়ের মধ্যে এক টুকরো বরফ। অবশ্য বাজারের বরফ নয়, ফ্রিজের বরফ।

চা খেতে খেতে কিকিরা বললেন, "জহর বলল, কাজ হয়নি," বলে না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন।

তারাপদ বলল, "আপনি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন।"

"মানে?"

"পরের চরকায় তেল দিচ্ছেন। পাঁজামশাইয়ের ঠিকুজি কোষ্ঠী জানতে আপনাকে কেউ লাগায়নি। জহরও বলেনি। আপনি নিজে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। তাও যদি দু' পয়সা আসত! কী লাভ, সার?"

কিকিরা বিরক্ত হলেন বোধ হয়। রাগ না করেই বললেন, "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।...আসলে কী জানো, এ হল অভ্যেস। এক রকম খেলাও বলতে পারো— চুপচাপ বসে থাকতে পারি না। ...তা সে যাই হোক, ওই পতাকীকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। বেচারি মানুষ। ভাল মানুষ। নিজের চোখে আমি দেখলাম লোকটা ট্রাম লাইনে কাটা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। পরে শুনলাম, ওটা নিছক অ্যাকসিডেন্ট নয়। তাই একটু খোঁজখবর করে দেখছি। টাকা কামানো আমার উদ্দেশ্য নয়, তারা।"

জহর কিকিরাকে দেখছিল।

কিকিরা শেষপর্যন্ত মাথা নাড়লেন। হতাশ গলায় বললেন, "না, এই প্রিন্ট থেকে কিছুই বোঝা যায় না। সত্যিই ভুতুড়ে।" বলে প্রিন্টটা তারাপদর হাতে দিলেন।

জহর তার সাধ্যমতো যতটা করা যায় করেছে। বিনয়বাবুর দেওয়া পুরনো নেগেটিভ থেকে, নয় নয় করেও তিনটে প্রিন্ট। সবই সমান। একপাশে কালো একটা ছোপ, যেন ঘন ছায়ার পরদা, বাকিটা সাদাটে বা ঈষৎ বাদামি ধোঁয়া। ধোঁয়ার আকারটাও কেমন যেন কুণ্ডলী পাকানো।

তারাপদ আর চন্দনও দেখেছে প্রিন্টগুলো। কিছুই ধরতে পারেনি।

চন্দন বলল, "আনাড়ি কেউ শাটার টিপেছিল ক্যামেরার। না হয় কোনও সোর্স থেকে আলো ঢুকে ফিল্ম নষ্ট করে দিয়েছে।" চন্দন ফোটো তুলতে পারে। শখের ফোটোগ্রাফার।

তারাপদ বলল, কিকিরাকেই, ঠাট্টার গলায়, "যাই বলুন সার, ওই প্রিন্টটাকে, মৃতজনের আত্মা বলে চালানো যায়। স্পিরিট আর কী!"

কিকিরা কথাটা শুনলেন। কিছু বললেন না ওকে।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে কিকিরা বললেন, "জহর, আমাদের একবার পাঁজাবাবুর বাড়িতে যাওয়া দরকার। মানে, যেতে পারলে ভাল হত। ওঁর দর্শন পাওয়ার একটা ব্যবস্থা..."

কথার মাঝখানে জহর বলল, "ব্যবস্থা মানে আপনি আমার সঙ্গে

যাওয়ার কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ। আমরা সবাই যেতে চাই।"

কী যেন ভাবল জহর, বলল, "কীভাবে যাব? হঠাৎ একটা দল করে এত অচেনা লোক ওঁর কাছে গেলে..."

"অসন্তুষ্ট হবেন? কিছু মনে করবেন?" কিকিরা বললেন, "সেটা স্বাভাবিক। তবে তুমি ভেবো না। আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি কাঁচা কাজ করব না।"

জহর সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "কবে যাবেন?"

"ক-বে! ...কাল হবে না। কাল যদি ছকু আসে, ওর দ্বারা কতটা কী হল জেনে নিই। পরশু বা তার পরের দিন হতে পারে।"

জহর আপত্তি করল না।

কিকিরা হঠাৎ পতাকীকে ডাকলেন। পতাকী দোকানেই ছিল।

"পতাকী, তোমার হাতে সে ব্যাগটা ছিল—ঠিক ওইরকম, অন্তত ওর মতন একটা ব্যাগ কাল কিনে রাখবে। চাঁদনিতেই পাবে। নিউ সিনেমার উলটো দিকে ফুটপাথে। মনে রেখো ব্যাগটা যেন তোমার ব্যাগের মতন হয়। রং একই রকম।" বলে কিকিরা পকেট থেকে টাকা বার করে পতাকীর হাতে দিলেন।

জহর প্রথমটায় বোঝেনি, পরে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আপনি টাকা দিচ্ছেন কেন, কাকা! আমি দিচ্ছি।"

"আরে রাখো! ক'টাই বা টাকা!"

"আমার বড় খারাপ লাগছে কাকা। আমার জন্যে—"

"তোমার খারাপ লাগার কোনও কারণ নেই জহর। আমি নিজেই যখন নাক গলাচ্ছি, তখন তোমার খারাপ লাগবে কেন! ...ও কথা থাক, তুমি ওই ভুতুড়ে প্রিন্টগুলোর একটা আমাকে দেবে। পাঁজাবাবুকে অন্য দুটো। কিন্তু তাঁকে বলবে না যে, আমায় দিয়েছ! বুঝলে!"
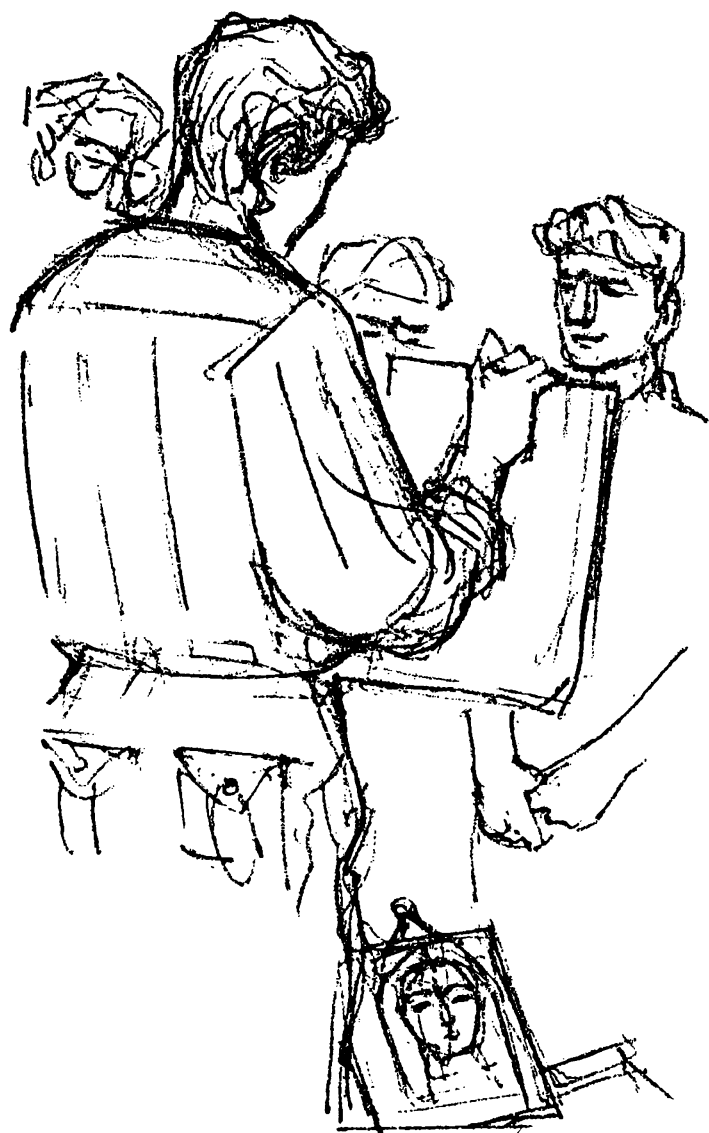
জহর মাথা নাড়ল। কিকিরার কথামতনই কাজ হবে।

চেয়ার সরিয়ে কিকিরা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমরা চলি আজ। চলো তারাপদ। কলকাতা ঠনঠনিয়া বীরভূম হরিদ্বার মায়ের অন্তর্ধান ভূমিকম্প ধস নামা—ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। দেখি কত জট পাকিয়েছে, কেনই বা!"

বাইরে এসে তারাপদ বলল, "সার, আপনার পাগলামির মাথামুণ্ডু আমি বুঝতে পারি না। হুট করে আপনি পাঁজাবাবুর বাড়ি যাবেন কেন? উনি আপনাকে ডাকেননি। কী করবেন আপনি ভুতুড়ে ওই প্রিন্ট নিয়ে! লাইফ আফটার ডেথ বইটইয়ে এরকম ছবি দেখা যায়। মৃতজনের আত্মা টাইপ। এদিকে আবার একটা ব্যাগ কিনতে বললেন পতাকীকে! সবই আপনার অদ্ভুত!"

কিকিরা হাসলেন, "শোনো তারাবাবু, ভাগ্য প্রসন্ন করার জন্যে জ্যোতিষীরা নানান রত্ন ধারণ করতে বলে। তাতে কী হয় জানি না। আমি বলি, বেস্ট রত্ন হল ধৈর্য। ওটাই ধারণ করা। মহাভারত পড়েছ? পাণ্ডবরা কতদিন ধৈর্য ধারণ করে বসে ছিল বলো তো?"

তারাপদ তামাশার গলা করে বলল, "সার কি আজকাল নতুন করে মহাভারত পড়ছেন?"

"তা মাঝে-মাঝে পড়ি। কেন, পড়লে আপত্তি কীসের!"

তারাপদ আর কিছু বলল না।

বাড়ি ফিরে কিকিরা দেখলেন, ছকু আর চন্দন দিব্যি গল্প করছে বসার ঘরে বসে। হাসাহাসি হচ্ছিল। চন্দনের গলার জোরই বেশি। বোঝা যায়, ছকুই বক্তা, চন্দন শ্রোতা।

তারাপদ সঙ্গেই ছিল কিকিরার। এখনও রাত হয়নি। আটটাও নয়।

কিকিরাকে দেখে ছকু লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল।

"বোসো, বোসো।" ছকুকে বসতে বলে কিকিরা চন্দনের দিকে তাকালেন। "তুমি কতক্ষণ?"

"ঘন্টাখানেক হবে। খানিক পরে ছকু এল। ওর কাছে গল্প শুনছিলাম। গল্পগুলো যদি সত্যি হয়, সার—তবে ওকে একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত। ছকু জিনিয়াস।"

ছকু যথারীতি কিকিরার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসে পড়ল। তার আগেই কিকিরারা বসেছেন।

"খবর বলো?" কিকিরা বললেন, "আমি ভাবছিলাম তুমি কাল সকালে আসবে।"

ছকু বলল, "না গুরুজি, আজই চলে এলাম। খবর ভাল নয়।"

"ভাল নয়!"

"দশ নম্বর ঘাঁটিয়া দেখে কানহাইয়া। সে বলল, ওই মাফিক ছোকরা—আপনি যেমন বললেন—কেউ তাদের খাতায় নেই। মালও কিছু জমা পড়েনি ওদের কাছে। এলিট সিনেমার পিছে ফিরিঙ্গি ওস্তাদ থাকে। সেও বলল, ওই ছোকরাকে কেউ দেখেনি।"

কিকিরা বুঝতে পারলেন। যে লোকটা, ছোকরাই বলা যায়—সেদিন ট্রাম লাইনের পাশ থেকে ব্যাগ নিয়ে পালিয়েছিল সে ওই চাঁদনি এলাকার পকেটমার ছিনতাইবাজদের দলে নেই, তাদের 'পকেটে' থাকে না। তাকে ওরা চেনে না।

ছকু বাজে কথা বলার মানুষ নয়। তার খোঁজখবরে ত্রুটি থাকার কথা নয়। তবে ওই ছোকরা যদি বেপাড়ার হয়, অন্য কথা। তবে বে-পাড়ার লোক এ-পাড়ায় নাক গলায় না। ওটা ওদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার ব্যাপার। হয়তো কখনও-কখনও এই নিয়ম ভাঙা হয়। তবে সেটা ব্যতিক্রম।

তারাপদ নিচু গলায় চন্দনকে দোকানের ঘটনা শোনাচ্ছিল।

একসময় চন্দন বলল, "বীরভূমের মামার বাড়ির কথা বলেছিস তো?"

"বলা হয়েছে।"

"কী বলল জহর?"

"কী বলবে আর! শুনে বোবা হয়ে বসে থাকল। ও এত কথার কিছুই জানে না।"

কিকিরা কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে বসে থাকলেন। ছকুকে দেখলেন আবার। খুব যে হতাশ হয়েছেন, মনে হল না। হয়তো তিনি পুরোপুরি আশাও করেননি, পতাকীর ব্যাগ আর উদ্ধার করা যাবে। তবে পকেটমার ছোকরা সম্পর্কে একটা খোঁজ পাওয়া যেতে পারে—এমন আশা ছিল। পাওয়া গেল না। অবশ্য না-পাওয়া একপক্ষে ভাল। ছোকরা তবে বাইরের আমদানি। হাজির হল কোথা থেকে? কীসের লোভে?

কিকিরা যা ভেবে রেখেছেন, সেভাবেই একটা চেষ্টা করা ছাড়া আপাতত অন্য উপায় নেই।

"ছকু?"

"গুরুজি—?"

"কাল হবে না, পরশু আমরা ও-বাড়ি যাব। পাঁজামশাইয়ের ঠনঠনিয়ার বাড়িতে। যাব সন্ধেবেলায়। আমরা সকলেই যাব। তারা, চাঁদু, তুমি আর আমি। জহরও যাবে।"

চন্দন ঠাট্টা করে বলল, "একটা পুলিশভ্যান ভাড়া করবেন নাকি?"

কথাটা কানেই তুললেন না কিকিরা, ছকুকেই বললেন, "তুমি কাল ওই বাড়ির আশপাশ যতটা পারো, নজর করে নেওয়ার চেষ্টা করবে। পারলে দু'-একজনের সঙ্গে আলাপ, গল্পগাছা। আমি যা শুনেছি—তাতে ও বাড়ির নীচের তলা শিয়ালদার কোলে বাজারের

মতন। যার যেমন খুশি থাকে, বারো ভাড়াটের হাট। তোমায় বাড়ির ভেতর যাওয়ার দরকার নেই। বাইরে থেকে যা নজরে আসে দেখে নেবে। হাওয়ার ঝাপটাতেও গাছের আম মাটিতে পড়ে হে! ভাল করে নজর করবে। আর পরশু দিন আমাদের আসল কাজ।”

চন্দন হেসে বলল, “ইটের দুর্গে প্রবেশ!”

“হ্যাঁ। সম্মুখ সমর। তুমি থাকবে ছকুর সঙ্গে, নীচে একতলায়। তারাপদ থাকবে, দোতলার সিঁড়ির মুখে, আর জহর আর আমি দোতলায় পাঁজাবাবুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ব। দেখা যাক...”

তারাপদ মাথা নেড়ে বলল, “অসম্ভব, সার। আপনি বরং চাঁদুকে দোতলায় রাখুন। ওর সাহস বেশি। আমি আপনার চেলা হয়ে সঙ্গে থাকব। প্লিজ।”

কিকিরা বললেন, “পরে সেসব দেখা যাবে। এখন আর কথা নয়।”

পাঁজাবাবুর বাড়ির একতলা সম্পর্কে যা শোনা গিয়েছিল তার কোনওটাই বাড়িয়ে বলা নয়। কোন আমলের পুরনো বাড়ি, অনুমান করা যায় না। বাড়ির মাঝখানে বিশাল চাতাল। চাতালের একপাশে এক বারোয়ারি চৌবাচ্চা। বোধ হয় সারাদিনই সুতোর মতন জল পড়ে। গোটাতিনেক কলও আছে বারান্দার গায়ে। চাতালের চারদিক ঘিরে সরু বারান্দা। গাঁ ঘেঁষে ছোট ছোট ঘর। খুপরিই বলা যায়।

নীচের তলার বাসিন্দাদের বিশেষ কোনও পরিচয় নেই। কোথাও মিস্ত্রি ক্লাসের কোনও লোক রয়েছে পরিবার নিয়ে, কোথাও পাঁচ-

ছ'জন বিহারি মজুর থাকে একসঙ্গে, রান্না খাওয়া মিলেমিশে। ওপাশে দুই ছোকরা হাওয়াই চটির কারবারি, ফুটপাথে বসে হকারি করে চটির। ট্রাম কোম্পানির এক কন্ডাক্টর থাকে পাশেই, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। মামুলি দরজি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, মায় এক স্টিলের বাসনওয়ালা—! আরও কত কী!

টিমটিমে আলো, পাঁচ সংসারের কলরব কালচে শ্যাওলার রং-ধরা উঠোন। অদ্ভুত এক গন্ধ এই নীচের তলায়।

কোনও সন্দেহ নেই, এরা যে যার খুশিমতন ভাড়া দেয় ঘরের, বা দেয় না। কারও কিছু বলার নেই। ওই বিচিত্র কলরব আর দুর্গন্ধের মধ্যে কোথাও রেডিয়ো বাজে, কোথাও বা টিভি চলে একটা।

কিকিরা জহরকে নিয়ে দোতলার সিঁড়ি ধরলেন। পিছনে তারাপদ।

যাওয়ার আগে ছকুর ইশারা থেকে বুঝে নিয়েছেন। তাঁর অনুমান অন্তত এক জায়গায় সঠিক।

ছকু আর চন্দন নীচের তলার সদরের বাইরে দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঢুকে দাঁড়াবার মতন মেজাজ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কিকিরা বললেন, "জহর, যা শুনেছিলাম এ যে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সত্যিই কোলে বাজার।...ধরো বাড়ির যা অবস্থা। হঠাৎ যদি ভেঙে পড়ে—"

"জনাপঞ্চাশ খতম," তারাপদ পিছন থেকে বলল।

দোতলার মাঝামাঝি সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে কিকিরার মনে হল, এ-বাড়িতে আলো জ্বালানো যেন নিষিদ্ধ। হলুদমতন যৎসামান্য আলো যা আছে—তা না থাকলেও ক্ষতি ছিল না। সিঁড়িতে বোধ হয় মানুষের পা পড়ে না, শুধু ধেড়ে টাইপের কয়েকটা ইঁদুর ছোটাছুটি করে। পাঁজামশাইয়ের কি এমনই অর্থাভাব যে, প্রয়োজন বুঝে আলো জ্বালাতেও দেন না, ওই যা টিমটিম করে জ্বলে তাই যথেষ্ট।

দোতলায় পা দিয়ে দেখা গেল, সামনে টানা বারান্দা। ঢাকা বারান্দা অবশ্য। বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাতি জ্বলছে। তার আলো এত কম যে, অত বড় বারান্দা প্রায় অন্ধকার। বাড়ির কাউকেই দেখা গেল না।

কিকিরা জহরকে বললেন, "ডাকো কাউকে।"

জহর ডাকল। "কে আছে?"

বারতিনেক গলা চড়িয়ে ডাকার পর বারান্দা-ঘেঁষা ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল। মাঝবয়েসি। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। দাড়ি গোঁফ কামানো নয়।

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল। দেখছিল কিকিরাদের।

কিকিরা জহরকে ইশারা করলেন। জহর বলল, "বাবুকে গিয়ে বলো জহরবাবু এসেছেন। জ-হ্-র।"

লোকটি জহরদের অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল।

কিকিরা চারপাশ দেখছিলেন। কলকাতা শহরে পুরনো বাড়ি অনেক দেখেছেন কিকিরা। এ বাড়ি যেন হার মানায় অন্যগুলোকে। এত জীর্ণ, হতশ্রী, অদ্ভুত এক গন্ধ—খসে পড়া বালি, সুরকির চুন আছে কি না বোঝা যায় না। অথচ ইমারতের গড়ন দেখলে মনে হয়, যে আমলেই হোক বাড়ি তৈরির সময় অন্তত রীতিমতন বাড়ির মালমশলা খরচ করা হয়েছিল।

নীচের ফাঁকা চাতাল থেকে সেই একই কলরব ভেসে আসছে। তবে অত জোরালো নয়।

কিকিরা আর জহর নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন। তারাপদ সামান্য পেছনে। তাকে বলা হয়েছে, সিঁড়ির দিকে চোখ রাখতে।

লোকটি ফিরে এল। "আসুন আপনারা। বাবু আসছেন।"

বারান্দা বরাবর দু'-তিনটে বন্ধ ঘর পেরিয়ে একটা ঘরে এনে কিকিরাদের বসতে বলল লোকটি।

ঘর খুলে আলো সে জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার সে পাখা খুলে দিল। আলো জ্বেলে দিল অন্য একটা দেওয়ালেরও।

বিশাল ঘর, মানে সাধারণ বড় ঘরের চেয়েও আকারে বড়। ঘর জুড়ে পুরনো আমলের সোফা, চেয়ার, আর্মচেয়ার, ডিভান। কোনওটাই আজ আর উজ্জ্বল নয়। ময়লা। ধুলো জমেছে। কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে এখানে ওখানে। ঘরের একপাশে একটা নকল বাজপাখি, বাঘের মাথা, দেওয়ালে হরিণের শিং। আর কিছু ছবি দেওয়ালে। তার মধ্যে একটা ছবি পাঁজামশাইয়ের কোনও পূর্ব-পুরুষের অয়েল পেন্টিং, মাথায় পাগড়ি, গায়ে রাজকীয় পোশাক।

কিকিরা আবাক হচ্ছিলেন, আবার কেমন যেন শঙ্কিত হচ্ছিলেন, যে চালাকির খেলাটা তিনি খেলতে এসেছেন, সে-খেলায় কি জিততে পারবেন!

হঠাৎ কিকিরার চোখ পড়ে গেল বাজপাখির ওপর। আশ্চর্য, বনেদি বাড়ির কেউ কেউ বসার ঘরে কুকুর, পাখি, এমনকী হায়েনার নকল মাথা সাজিয়ে রাখে। বাজপাখি কিকিরা আগে কোথাও দেখেননি। পাখিটা দেখলে মনে হয় জীবন্ত।

পায়ের শব্দ হল।

পাঁজামশাই ঘরে এলেন। বিনয়ভূষণ পাঁজা।

জহররা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বিনয়ভূষণ কিকিরাদের দেখছিলেন। তাঁর কৌতূহল হচ্ছিল।

জহর বলল, "আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আপনি বসুন।"

বিনয়ভূষণ বসলেন। হাতের ইশারায় কিকিরাদের বসতে বললেন, "বসুন। আপনারা..."

নমস্কারের সৌজন্যপর্ব চুকিয়ে কিকিরাও বসে পড়েছেন ততক্ষণে।

"ইনি আমার বাবার বন্ধুর মতন ছিলেন," কিকিরাকে দেখিয়ে জহর বলল, "আমি কাকা বলে ডাকি। নাম কিঙ্করকিশোর রায়। আর উনি কাকার সঙ্গে এসেছেন...।" বলে তারাপদকে দেখাল।

কিকিরা বিনয়ভূষণকে দেখছিলেন। বৃদ্ধই ধরা যেতে পারে, তবে অক্ষম নন শারীরিক ভাবে। এখনও পিঠ সোজা, গাল-মুখ শুকিয়ে কুঁচকে যায়নি। ওঁর পরনে ধুতি, গায়ে হাফ হাতা গেঞ্জি। গলার কাছে বোতাম দেওয়া। পায়ে তালতলার চটি। বাঁ হাতে চশমার খাপ। চোখে চশমা নেই। বোঝা যায় দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয় না, চশমাটা কাছের বস্তু দেখা বা পড়ার জন্যে। ধবধবে ফরসা রং গায়ের। মাথার চুল সাদা এবং স্বল্প। গলায় একটি ছোট মাপের সোনার হার।

জহর বলল, "সেদিন যা ঘটেছিল রায়কাকা স্বচক্ষে দেখেছেন। ওইজন্যে ওঁকে নিয়ে এলাম। পতাকীদার কোনও দোষ নেই।... তা ছাড়া কাকারও কিছু বলার আছে।"

বিনয়ভূষণ বললেন, "আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ," কিকিরা বললেন, "একটা কাজে আমি ওদিকে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা চোখে পড়ে যায়। পতাকীকে আমি চিনি। অনেকদিন। স্টুডিয়োয় কাজ করে জানি।"

"বুঝতে পারছি। তা আপনি কি এই কথাটাই বলতে এসেছেন?"

মাথা নাড়লেন কিকিরা। বললেন, "না, আমি একটা ব্যাগ আপনাকে দেখাতে এসেছি।"

"ব্যাগ! কীসের ব্যাগ!"

কিকিরার কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা ছিল। তার মধ্যে হাত ডুবিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগ বার করলেন। দেখতে প্রায় কালো। লম্বায় ফুটখানেক। পতাকীকে দিয়ে ব্যাগ কিনিয়ে সেটার চেহারা পুরনোর মতন করা হয়েছে। যদিও তা হয়নি।

"এই ব্যাগ—," কিকিরা বললেন "আগে আপনি দেখেছেন?"

বিনয়ভূষণ ব্যাগ দেখতে দেখতে অবাক হয়ে বললেন, "তা আমি কেমন করে বলব! তবে হ্যাঁ, জহরের সেই লোকের হাতে এইরকম ব্যাগ ছিল! ...আপনি কি ব্যাগটা উদ্ধার করেছেন?"

জহর তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ—। উনি..."

"উনি কুড়িয়ে পেয়েছেন? কেউ দিয়েছে?"

জহর বলল, "আজ্ঞে, মানে— ঠিক কুড়িয়ে পাওয়া নয়। দেয়নি কেউ?"

"তবে?"

কিকিরা এবার নিজেই কথা বললেন। "আমি অনেকদিন ধরেই ওদিকে ঘোরাফেরা করি। চেনা লোকজন আছে। চুরিচামারি, পকেটমার, ছিনতাই হলে খোঁজখবর পাই।"

"আপনি পুলিশের লোক?"

"আজ্ঞে না। পুলিশের লোক নয়। তবে ওই যে গুমঘর লেনের কাছে বাচ্চাদের একটা ক্লিনিক আছে। পোলিও পেশেন্টদের দেখাটেখা হয়, তার পাশে একটা ছোট বাড়ি আছে। সেখানে কাঁচা চোরছ্যাঁচড় পকেটমারদের শুধরোনোর চেষ্টা করা হয়। থানা পুলিশ থেকেই পাঠায় অনেককে। আমি ওখানে যাই। ধরাপড়া ছোকরাগুলোকে বাবা-বাছা করে ধর্মকথা শোনাই, বারণ করি কুকর্ম করতে।" কিকিরা আগেই মনে মনে এসব কথা বানিয়ে রেখেছিলেন।

বিনয়ভূষণ অবাক হয়ে বললেন, "কই, এরকম তো আগে শুনিনি। জুভেনাইল কোর্ট বলে একটা কী আছে শুনেছি। তা সে তো অন্য ব্যাপার।"

"কত কী আছে পাঁজামশাই, আমরা কি সব জানি? না, খোঁজ রাখি!"

মাথা নাড়লেন বিনয়ভূষণ। "আপনি বলতে চাইছেন ব্যাগটা সেখান থেকে পেয়েছেন?"

"আজ্ঞে, যথার্থ।"

"আমার জিনিসটা কই? সেই খাম—?"

"ফোটোর কথা বলছেন!" কিকিরা বললেন, "কী বলি আপনাকে বলুন তো! যে-বেটা ব্যাগ মেরে পালিয়েছিল সেই রাস্কেলটা ব্যাগের মধ্যে টাকা-পয়সা যা ছিল— পকেটে পুরে বাকি যা কাগজপত্র ছিল ছিঁড়ে দলা করে পাকিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে।" কিকিরার বলার ধরনে ইতস্তত ভাব, একটু যেন কুণ্ঠা, সেভাবে গোছানো নয় কথাগুলো। এ-সবই তাঁর ইচ্ছাকৃত।

বিনয়ভূষণ কেমন বিহ্বল, হতবাক। মুখে কথা নেই। শেষে বললেন, "ফেলে দিয়েছে, আঁস্তাকুড়ে?"

"আজ্ঞে, চোরের আর কাগজপত্র কী কাজে লাগবে! টাকা যা পেয়েছে— নিয়েছে। কাগজ তো সোনাদানা ঘড়ি আংটি নয় যে, বাজারে বেচা যাবে! ফেলে দিয়েছে।"

সেই লোকটি আবার ঘরে এল। হাতে শ্বেতপাথরের বড় থালা। তিনটি গ্লাস, গ্লাসে শরবত। কাচের গ্লাস নয়, জার্মান সিলভারের গ্লাস। অল্প কারুকার্য গ্লাসের গায়ে।

শরবত এগিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটি।

বিনয়ভূষণকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছিল। তবু সৌজন্য দেখিয়ে কিকিরাদের শরবত খেতে বললেন।

তারাপদ অস্বস্তি বোধ করছিল। কিকিরা হয়তো ভুল করেছেন। এভাবে জড়িয়ে পড়া উচিত হয়নি তাঁর।

জহরও চুপ।

বিনয়ভূষণ হঠাৎ বললেন, কিকিরাকেই, "আপনি কি আমাকে একটা ছেঁড়া পুরনো ব্যাগ দেখাতে এসেছেন! এর কোনও দরকার

ছিল না।" বলে জহরের দিকে তাকালেন। মনে হল জহরের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

কিকিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে বিনীতভাবে বললেন, "আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হওয়ারই কথা। কিন্তু আমি ঠিক ব্যাগ দেখাতে আসিনি। ...একটা কথা আপনাকে বলে নিই। কিছু মনে করবেন না। অন্যের ব্যাপারে আমার অকারণ মাথা গলাবার অভ্যেস নেই। এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। পতাকীকে আমি অনেককাল ধরে চিনি। সে ভাল মানুষ, নিরীহ, গরিব। জহর সবই জানে।" শরবত খেলেন সামান্য কিকিরা। ঘরের চারপাশ তাকালেন একবার, তারপর বিনয়ভূষণকে বললেন, "সেদিন আমি নিজের চোখে যতটুকু দেখেছি— তাতে মনে হয়েছে, মামুলি পকেটমারের কাজ ওটা নয়। পতাকীকে ট্রাম থেকে ফেলে দেওয়া, আর ওই ব্যাগ নিয়ে পালানোর একটা মতলব আগেই করা হয়েছিল। আমি যা করছি পতাকীর জন্যে করছি। অবশ্য জহরের জন্যেও খানিকটা।"

বিনয়ভূষণ আরও বিরক্ত হলেন। "কী বলছেন আপনি! ওই পতাকীকে কে ট্রাম থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে চাইবে! কেন? কাউকে চলন্ত গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া বিরাট অফেন্স। ও তো মারা যেতেও পারত।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। এ-কাজ কে করল?"

"কে করল? মানে?"

"আপনি অনুমান করতে পারেন না?"

বিনয়ভূষণ থতমত খেয়ে গেলেন। "আমি! কী বলছেন মশাই, আমি কেমন করে অনুমান করব!"

কিকিরা বললেন, "কাউকে সন্দেহ হয় না!"

"কাজের কথা বলুন। না হয় আমায় ছেড়ে দিন। আমি বুড়ো লোক— এখন আমার বিশ্রামের সময়!"

কিকিরা সামান্য হাসলেন। "আপনার মায়ের ফোটো আমার কাছে আছে। যদিও সেটা ছেঁড়াফাটা, চটকানো। চিনে নিতে অসুবিধে হয়।"

"আপনার কাছে আমার মায়ের ফোটো আছে!" বিনয়ভূষণ যেন উঠে বসার মতন পিঠ সোজা করলেন। উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

"আপনার ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, যা পাওয়ার আপনি পাবেন। তার আগে আপনি বলুন, আপনার মায়ের, বৃদ্ধা বিধবা মায়ের যে ফোটো আপনি প্রায় বছরছয়েক আগে তুলিয়েছিলেন জহরকে দিয়ে, এতদিন পরে হঠাৎ সেটার জন্যে এত উতলা হয়ে উঠলেন কেন? কেন ওই ফোটো থেকে আরও বড় সাইজের একটা ছবি তৈরি করে দিতে বললেন?"

বিনয়ভূষণ কিকিরাকে দেখছিলেন একদৃষ্টে। প্রথমে তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হল, অজানা অচেনা বাইরের একটা লোকের এই ধৃষ্টতায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও বিস্মিত। কী যেন বলতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করলেন।

কিকিরা শান্তভাবে বললেন, "আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।"

বিনয়ভূষণ কিছুক্ষণ কোনও কথা বললেন না। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "এসব আমার ব্যক্তিগত কথা। আমার মা...।"

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কিকিরা বললেন, "আপনার মায়ের কথা আমরা কিছু কিছু জানি।"

"জানেন? কেমন করে?" বিনয়ভূষণ যেন বিশ্বাস করছিলেন না।

"খোঁজ নিয়েছি। উনি বীরভূমের ডুমুরগ্রামের জমিদার পরিবারের মেয়ে। কলকাতায় তাঁর বিবাহ হয়। এই বাড়ি তাঁর শ্বশুর বংশের, মানে এখন আপনার পৈতৃক বাড়ি।"

বিনয়ভূষণ মাথা নাড়লেন। "হ্যাঁ। ...সঠিক খবরই জোগাড় করেছেন।"

"আরও দু'-একটা খবর বলতে পারি। এই বাড়ি ছাড়া কলকাতায় ও আশেপাশে যেসব সম্পত্তি আপনাদের এককালে ছিল— এখন তা দেনার দায়ে হাতছাড়া। অবস্থা আপনাদের...।"

"কী হবে শুনে! আমি নিজেই বলছি, এখন আমি ভিখিরি। অপচয় আর অহংকার আমার বাবার মাথায় ভূতের মতন চেপে বসেছিল। সেইসঙ্গে দুর্ভাগ্য। যাতে হাত দিয়েছেন ব্যর্থ হয়েছেন, টাকা-পয়সা জলে পড়েছে। ...তা এ-সবই আমি আমার মন্দভাগ্য বলে মেনে নিয়েছি। ...শুধু শেষ বয়েসে একটা জিনিস পারিনি।...শুনবেন সে-কথা?"

কিকিরা মাথা হেলালেন। শুনবেন।

বিনয়ভূষণ প্রথমটায় চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেন।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললেন, দেখলেন না কিকিরাদের, যেন নিজের মনে-মনেই বললেন, "পাপ আর পাঁক— এর মধ্যে পা ডুবলে মানুষ তলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। জন্তুও যায়। তবে পাপে নয়, কেন না তারা মানুষ নয়, পাপপুণ্য জানে না। আমরা দাদামশাই তাঁর আমলে করেছিলেন বিস্তর, তবে নষ্টও করেছেন। তিনি গত হলে, আমার দিদিমা জমিদারির রাশ টেনে নেন। না, নেন বলব না, 'নেয়' বলব। দিদিমাকে আমি দেখেছি ছেলেবেলায়। আপনি-টাপনি করে কথা বলতাম না। আপনি খোঁজ করলে জানতে পারবেন, আমার দিদিমাকে ওদিককার লোক বলত আর-এক দেবী চৌধুরাণী। দেখতে সুন্দর, তবে স্বভাবে হিংস্র। লাঠিয়াল, ডাকাত, বল্লমবাজ

সবই পুষত দিদিমা। মামলা আর খুনোখুনি দাঙ্গা লেগেই থাকত।"

তারাপদ বলল হঠাৎ, "উনি নিজে খুনোখুনি করতেন?"

"দিদিমার পোষা লোকরা করত। হুকুম থাকত দিদিমার। ...তা ওই দিদিমা যখন নানা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়েছে তখন আমার মা, আমি, বাবা— কলকাতায়। খবর এল দিদিমাকে কেউ চালাকি করে বিষ খাইয়েছে। আমরা ডুমুরগ্রাম পৌঁছোবার আগেই দিদিমা মারা গেল।"

"কী বিষ?"

"জানি না। গাঁ গ্রামে কতরকম বিষের চল আছে কে জানে! সেঁকো বিষ হতে পারে।...কেউ আবার বলল, দিদিমা নিজেই বিষ খেয়েছে।"

"কেন?"

"আমার এক ছোট মাসি ছিল। মাসি বেশিরভাগ সময়েই বাপের বাড়িতে থাকত। মাসি হঠাৎ বিধবা হয়ে গেল। শোকের ধাক্কাটা নাকি সহ্য করতে পারেনি দিদিমা। আমার মা আর মাসি ছাড়া দিদিমার অন্য কোনও সন্তানাদি নেই।"

"মাসির একটি ছেলে ছিল না?"

"জানেন? হ্যাঁ ছিল। খেপাটে, নির্বোধ, জেদি। সে কার পাল্লায় পড়েছিল কে জানে! বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াত। শেষে শ্মশানে গিয়ে কী করত জানি না। কোনও তান্ত্রিকের সঙ্গ নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।"

"কম বয়েসেই?"

"হ্যাঁ পনেরো ষোলো বছর বয়েস থেকেই খেপামি শুরু হয়েছিল। কুড়ি একুশে ঘরছাড়া। আমার চেয়ে বয়েসে ছোট ছিল। আমরা তার খবর পেতাম না। মাসিও একদিন মারা গেল।"

বিনয়ভূষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

ঘরের আলোও কেমন অনুজ্জ্বল হয়ে আসছিল। তারাপদ চোখ সরিয়ে ভেতর দরজার দিকে তাকাতেই সেই নকল বাজপাখির ওপর দৃষ্টি পড়ল। দেখলে বাস্তবিক ভয় হয়।

কিকিরা বললেন বিনয়ভূষণকে, "আপনার মায়ের কথা একটু বলুন। উনি যে হরিদ্বারে তীর্থ করতে গিয়ে..."

"আপনি শুনেছেন? কে বলল?"

"জহর।" কিকিরা টেপ রেকর্ডার লুকিয়ে রাখার কথা আর বললেন না।

বিনয়ভূষণ বিষণ্ন গলায় বললেন, "মানুষ বোধ হয় তার দিন ফুরিয়ে আসার আগে ভেতরে ভেতরে কিছু বুঝতে পারে। কেউ কেউ নিশ্চয় পারে। আমার মা বোধ হয় পেরেছিল। একদিন নিজেই বলল, 'আমার একটা ছবি তুলিয়ে রাখ। পুজোর আসনে বসে জপ করছি। যখন থাকব না ওটাই দেখবি।' ...আমি কোনওদিন মায়ের কথা অমান্য করিনি। জহরকে বাড়িতে ডেকে এনে ফোটো তোলালাম। এরকম ফোটো আপনি হয়তো ঘরে ঘরে দেখবেন। ভেরি কমন। মায়ের মনে কী ছিল জানি না, শেষ ছবিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে মা বায়না ধরল, শেষ বয়েসে তীর্থে যাবে। তীর্থ তো আগেই সারা হয়েছিল, বাকি ছিল হরিদ্বার হৃষীকেশ কেদার— ওই দিকটা। মায়ের বয়েস হয়েছে তবে পঙ্গু হয়ে পড়েনি।...সবরকম ব্যবস্থা করে মাকে নিয়ে গেলাম হরিদ্বার। তারপর, ঘোরাফেরার পথে কী ঘটে গেল জানেন বোধ হয়। জহর বলেনি?"

"বলেছে। জানি। শুনেছি।"

"তা হলে আর তো আমার বলার কিছু নেই।"

"একটু আছে। এতকাল পরে ওই বিশেষ ফোটোটা নিয়ে...

বাধা দিয়ে বিনয়ভূষণ বললেন, "আপনি মশাই একটা কথা জানেন না। আপনি কি জানেন আমার মায়ের শ্রাদ্ধকর্ম হয়নি।

হয়নি, কারণ, আমাদের যিনি কুলপুরোহিত, তিনি অবশ্য নেই, তাঁর ছেলে আছেন, তিনিই এখন আমাদের পুরোহিত। আমি ইদানীং প্রায়ই মাকে স্বপ্ন দেখতাম। খারাপ লাগত। পুরোহিতমশাইকে বললাম। তিনি বললেন, অপঘাতে মৃতজনের প্রেতকর্ম হয় না। আর শাস্ত্রমতে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির শ্রাদ্ধকর্ম করার কতক নিয়ম মানেন প্রাচীনরা। যেমন নিরুদ্দিষ্ট হলে বারো বছরের আগে স্ত্রী তার স্বামীর শ্রাদ্ধকর্ম করতে পারে না। নিয়ম নেই। সেইরকম পুত্রসন্তানকেও কিছু নিয়ম মানতে হয়। এক্ষেত্রে আমি সন্তান হিসেবে মায়ের নিরুদ্দেশ হওয়ার পাঁচ বছর আগে কোনও শ্রাদ্ধকর্ম করতে পারি না। তবে এসব প্রাচীন লোকমত। যে মানে সে মানে, নয়তো মানে না।”

“বুঝেছি। আপনার মা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।”

“হ্যাঁ।”

“আপনি মায়ের শ্রাদ্ধকর্মে তাঁর ওই শেষ ফোটোটি বড় করে তুলিয়ে...।”

“ঠিকই বলেছেন।”

“ওটা যদি নাই পেতেন, মায়ের অন্য ফোটো—?”

“না। আপনি কোথাকার মানুষ আমি জানি না। এখন তো সবই হয়। কিন্তু আপনার জানা নেই, তখনকার দিনে বনেদি সম্ভ্রান্ত বাড়িতে বিধবা বয়স্কা মহিলাদের ফোটো যখন-তখন তোলা যেত না। পরিবারের আচার বিচারে বাধত। ...আরে তেমন হলে তো আমি আমার বাবা-মায়ের একসঙ্গে তোলা পুরনো ছবিও নিতে পারতাম। তা তো হয় না। তা ছাড়া ওটি আমার মায়ের শেষ ফোটো। তাঁর কথাতেই তোলা।”

কিকিরা তারাপদকে বললেন, “দেখো চাঁদুরা কী করছে। ডাকো

ওদের। ছকুকে বলবে ছোকরাকেও ধরে আনতে।” কিকিরা জানতেন, ছকু আজও ছোকরাকে এই গলির মধ্যে দেখেছে। চায়ের দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে বসে ছিল। ছকু বলেছে তাঁকে।

তারাপদ চলে গেল।

বিনয়ভূষণ অবাক হয়ে বললেন, “ওরা আবার কে? কাকে ডাকতে পাঠালেন?”

“আমার লোক।”

“আপনার লোক! তারা এখানে কেন?”

কিকিরা বললেন, “ওরা আসুক, দেখতেই পাবেন।”

“আপনার কথাবার্তা বড় ধোঁয়াটে। যাকগে, আমার মায়ের ফোটোটা দিন। আপনি বলেছেন, ফোটো দেবেন। কই, দিন।”

কিকিরা মাথা নাড়লেন। “দেব। একটু অপেক্ষা করুন। আচ্ছা পাঁজামশাই, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। আপনার মায়ের শ্রাদ্ধশান্তির কাজ কবে করবেন ঠিক করেছিলেন?”

“এই পূর্ণিমার পর। তৃতীয়া তিথিতে।”

“এ-বাড়িতে? না, মামার ভিটে ডুমুরগ্রামে?”

“আপনি কি পাগল! এই বাড়ি মায়ের স্বামীর ভিটে। মায়ের শ্রাদ্ধকর্ম তার বাপের বাড়িতে হবে কেন? এ বাড়িতেই হবে।”

“আমার ভুল হয়েছিল। যাক, বাদ দিন। এই বাড়ি আগলে আপনি কতদিন বসে থাকবেন। বাড়ির যা হাল...”

কিকিরার কথা শেষ হওয়ার আগেই ছকু আর চন্দন একটা ছোকরাকে ধরে আনল। সঙ্গে তারাপদ। ছকু ছোকরার গলা জড়িয়ে তার কোমরের কাছে ছকুর বিখ্যাত অস্ত্রটি ধরে আছে। সাইকেলের চাকার স্পোকের মতন সরু দেখতে। অথচ বড় ভয়ঙ্কর এই অস্ত্র। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও শক্ত। ছকু এর নাম দিয়েছে, ‘সূচা’। মানে, দ্য নিড্‌ল।

কিকিরা চিনতে পারলেন। সেই ছোকরা। ট্রাম লাইনের গায়ে

ফুটপাথ থেকে ব্যাগ তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। এখন অবশ্য গায়ে লাল-সাদা গেঞ্জি নেই। অন্য জামা।

বিনয়ভূষণ হতবাক। এসব কী করছে এরা বাড়ির মধ্যে!

কিকিরা বললেন, "চেনেন একে?"

"দেখেছি। কাছেই থাকে। কী নাম যেন, কী নাম! চু-চুনি।"

চুনির অবস্থা দেখে মনে হল ভীত, আতঙ্কিত, হতবুদ্ধি। সে যেন এমন এক জালে জড়িয়ে পড়েছে, যেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনও উপায় নেই। ছকুর হাতের অস্ত্রটা তার কোমরে ফুটছিল। একটু জোর দিলেই পেটে ঢুকে যাবে।

কিকিরা বললেন, "এই ছোকরাই সেদিন পতাকীকে ট্রাম থেকে ফেলে দিয়েছিল কায়দা করে। আর ওকেই আমি দেখেছি, ব্যাগ তুলে নিয়ে পালাচ্ছে। ওর কাছেই আপনি ফোটোর হদিস পাবেন।"

বিনয়ভূষণ বিহ্বল, বিমূঢ়। কথা আসছিল না। শেষে বললেন, "কোথায় ফোটো?"

চুনি বলতে চাইছিল না। কিন্তু ছকুর অস্ত্রটার খোঁচা লাগল। কী যেন গালমন্দ করল ছকু।

"কোথায় ফোটো?"

চুনির গলা জড়িয়ে গেল। ভয় পেয়েছে। "সাধুবাবার কাছে।"

"কী?" বিনয়ভূষণ যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। "সাধু—এ বাড়ির সাধু।"

"আমি ঠিক বলেছি বড়বাবু। মা কালীর পা ছুঁয়ে বলতে পারি। বিশ্বাস করুন। আমাকে টাকা দিয়েছিল সাধু।"

বিনয়ভূষণ আর সংযত থাকতে পারলেন না। চেঁচিয়ে ডাকলেন কাউকে।

সেই লোকটি এসে দাঁড়াল।

"ওপর থেকে সাধুবাবুকে ডেকে দাও। আর শিবুকে।"

লোকটি চলে গেল।

কিকিরা বললেন, "ওপরে—মানে তেতলায়। সেখানে লোকজন থাকে?"

"না। লোক নয়, শয়তান। আজ আমি তাকে দেখে নেব।" উত্তেজিত হয়ে বিনয়ভূষণ উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে ডাকলেন শিবুকে। বসে পড়লেন আবার।

শিবু এল।

বিনয়ভূষণের বোধবুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছে। বললেন, "ছোট দেরাজের মাথায় চাবি আছে। বড় আলমারি খুলে বন্দুক আনবে আমার। টোটাও পাবে আলমারির তলায়। যাও।"

যে-লোকটি এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখলে মন বিরূপ হয়ে ওঠে। ভদ্র সাংসারিক পরিবেশের সঙ্গে একেবারে বেমানান, গাঢ় গেরুয়া রঙের বসন পরনে। গায়ে জামা নেই, গেরুয়া চাদর মাত্র। গলায় দু'-তিন ধরনের মালা, রুদ্রাক্ষ আর রঙিন পাথরের। মাথার চুল ঝাঁকড়া, রুক্ষ, জট পড়ে আছে। মুখে দাড়ি গোঁফ। পেকে গিয়েছে অর্ধেক। বাঁ চোখটি ছোট, পাতা যেন বুজে রয়েছে। পিঠে সম্ভবত কুঁজ আছে ; বেঁকে হেলে দাঁড়িয়ে থাকলেন ভদ্রলোক।

কিকিরা কিছু বলার আগেই বিনয়ভূষণ বললেন, রাগে ঘৃণায় গলা কাঁপছিল, "গত বছরখানেকের বেশি এই বাড়ির তেতলায় ও রয়েছে। ওই সাধুবাবু।"

এই বাড়ির তেতলা! কিকিরারা তো শুনেছেন তেতলার দরজা

জানলা খোলা থাকে না বাড়ির। খড়খড়ি-করা দরজা বন্ধই থাকে বরাবর। রাজ্যের পায়রা, তাদের ময়লা, খসে পড়া পালক পড়ে থাকে জঞ্জাল হয়ে। আর থাকে ইঁদুর, বাদুড়, চামচিকে। সাধুবাবুকে দেখে মনে হল, অন্ধকার আর দুর্গন্ধময় ওই নরক থেকে সত্যিই ওই মানুষটি বেরিয়ে এসেছেন।

বিনয়ভূষণ বললেন সাধুবাবুকে, উত্তেজনায় গলা কাঁপছে, "মুখে রক্ত তুলে মরতে বসেছিলে রাস্তায়। আঁস্তাকুড়ে তোমায় মরতে হত। এখানে এসে আশ্রয় চাইলে, দয়া করে থাকতে দিয়েছিলাম। আর তুমি আমার সঙ্গে বেইমানি করে ওই গুণ্ডা ক্লাসের ছেলেটিকে পেছনে লাগিয়েছিলে আমার। শয়তান, অকৃতজ্ঞ—।"

সাধুবাবুর যেন রাগ উত্তেজনা নেই। নির্বিকার গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "না ; আমার কৃতজ্ঞতা নেই। তুমি তোমার মায়ের ছবি সাজিয়ে ঘটা করে শ্রাদ্ধ করবে আর আমি দেখব!"

"কেন দেখবে না? তুমি কে?"

"আমি কে—তুমি জানো, আমিও জানি। তোমার মায়ের বলা ছিল, তার মৃত্যুর পাঁচ বছর আগে তুমি ডুমুরগ্রামের বাড়ি সম্পত্তি, কোনও কিছুতেই হাত দিতে পারবে না। তোমার সে-অধিকার নেই। কী তুমি অস্বীকার করবে? করলে আমি প্রমাণ দেখাতে পারি...."

"না। আমি ঠগ জোচ্চর নই। মায়ের আদেশ, ইচ্ছে কাগজপত্রে লেখা আছে।"

"কিন্তু এটা লেখা নেই যে, তোমার মায়ের যে শেষ ফোটো তুমি তুলিয়েছিলে, সেই ফোটোর চারপাশে বাহারি ডিজাইন করা লাইন টেনে ওটা বাঁধাবার পর ফোটোর চার কোণে চারটি অক্ষর তোমার মা পরে বসিয়ে দিয়েছিল।" সাধুবাবুর দাঁতগুলো দেখা গেল এক পলক। হয়তো ঘৃণাভরে হাসলেন। "চারটি অক্ষর কী, তুমি জানো। শুনবে?"

“ভয় দেখাচ্ছ আমাকে! আমি তোমার মতন একটা নোংরা জন্তুকে গুলি করে মারতে পারি। তুমি আমাদের মাতুল বংশের মান ইজ্জত সম্ভ্রম—সব নষ্ট করেছ। মাসিকে তিলে তিলে মেরেছ।”

“যা করেছি তা করা হয়ে গিয়েছে। সেটা পুরনো কথা। আমি যা ভেবেছিলাম, চেয়েছিলাম—তা পাইনি। সবই মিথ্যে হয়ে গেল। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ছাই হয়ে গিয়েছিল কে না জানে! ...ও কথা থাক, আসল কথা বলি। ওই চারটে অক্ষর হল 'ম' 'তি' 'হা' 'সি'।... তুমি জানতে না ওই অক্ষরগুলোর মানে কী? পরে জেনেছ।”

কিকিরা অবাক হয়ে বললেন, “ম-তি-হা-সি। মানে কী?”

সাধুবাবু বললেন, “ওকে জিজ্ঞেস করুন।” বলে বিনয়ভূষণের দিকে তাকালেন, “তুমি যুধিষ্ঠির নাকি! তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আর আমি চোর! শোনো, আমাদের ডুমুরগ্রামের মদনমোহন মন্দিরে যে বিগ্রহ আছে মদনমোহনের, তার তিন হাত তলায় এক সিংহাসন লুকনো আছে সোনার হীরে। চুনি বসানো। দিদিমার কীর্তি। তুমি ওই সিংহাসন তুলে নেওয়ার পর তার বিক্রির অর্ধেক টাকা আমায় দেবে। বাদবাকি যা সম্পত্তি, যত কমই হোক—তারও আধা ভাগ। মদনমোহন আর তোমার মা—মানে মাসির নামে প্রতিজ্ঞা করো, ফোটো আমি তোমায় দেব।”

কেউ কিছু বোঝার আগেই, বিনয়ভূষণ বন্দুকটা তুলে নিলেন। শিবু যে কখন এসে মনিবের হাতে বন্দুক দিয়েছে, কেউ খেয়াল করেনি। পুরনো আমলের একনলা বন্দুক। টোটা পোরা ছিল কি না কে জানে!

বিনয়ভূষণ উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মাথা ঘুরছিল। টলে যাচ্ছিলেন।

সাধুবাবুর ভ্রুক্ষেপ নেই। জড়ানো গলায় বললেন, “তোমার মা—আমার মাসি ধাঁধা করে পদ্য লিখত। ফোটোর পিছনে কী

লিখেছিল তুমি আগে ধরতে পারতে না। শুনবে ধাঁধাটা? মনোহর মোহন অতি/ তাঁহারে করিবে নতি/তিন সূতা নীচে যাবে/চাও যাহা তাহা পাবে ॥” ...মানেটা তোমার মাথায় ঢুকত না। নির্বোধ তুমি। ‘মোহন’ হল ‘মদনমোহন’ ; তিন সূতা হল ‘তিন হাত’, ওটা হল গেঁয়ো মাপের হিসেব। আর মদনমোহনের মূর্তির হাততিনেক নীচে গেলে তুমি যা চাও তাই পাবে...।”

বিনয়ভূষণ উন্মাদের মতন চেঁচিয়ে উঠলেন, “রাস্কেল! নেমকহারাম।”

“আমাকে তোমার যা খুশি বলো। আমি এখানে বসে বসে তোমার সমস্ত কিছু নজর করেছি। তোমার টেলিফোন লাইনের সঙ্গে তার টেনে আড়িও পেতেছি। হ্যাঁ করেছি। অন্যায় করিনি।”

বিনয়ভূষণ নিশানা ঠিক করতে পারছেন না মাথা ঘুরছে। চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা।

“শয়তান, আজ আমি তোমায়...”

তারাপদ আর চন্দন আতঙ্কে কেমন এক শব্দ করে উঠল। কিকিরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ছকু লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিনয়ভূষণের ওপর।

একটা শব্দ হল। গুলির শব্দ। ঘর কেঁপে উঠল যেন। নকল বাজপাখিটা ছিটকে উঠে মাটিতে পড়ে গেল।

সাধুবাবু নির্বিকারভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

বিনয়ভূষণ টলতে টলতে চেয়ারে বসে পড়েছেন। চোখের পাতা খুলছেন না। ঘামছেন। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল বুঝি!

চন্দন এগিয়ে গেল বিনয়ভূষণের দিকে।

আশ্চর্য, চুনি কিন্তু পালিয়ে গেল না, দাঁড়িয়ে থাকল স্থির হয়ে।